পিকনিক

রমাপদ চৌধুরী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

তুলতুলকে

এবং

জাঁলকে

এই লেখকের

॥ উপন্যাস ॥

হৃদয়
খারিজ
এখনই
জনৈক নায়কের জন্মান্তর
বনপলাশির পদাবলী
লালবাঈ
দ্বীপের নাম টিয়ারঙ
প্রথম প্রহর
এই পৃথিবী পান্থনিবাস
পরাজিত সম্রাট
অরণ্য আদিম

॥ গল্প ॥

গল্প-সমগ্র
ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য গল্প

॥ প্রবন্ধ ॥

একসঙ্গে
লেখালিখি

পিকনিক

রাখী বলেছিল জায়গাটা খুব সুন্দর। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। এসে পেঁছলে হঠাৎ মনে হবে চারপাশের নোংরা পৃথিবী থেকে টপ্ করে পা তুলে নিয়ে কবিতার কিংবা স্বপ্নের সবুজে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছি।

রাখী যখন জায়গাটার বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন ওর মুখচোখ খুশীতে ঝকঝক করে উঠেছিল। কি সবুজ, কি সবুজ, একটানা নরম কার্পেটের মত, তার মধ্যে একটা না দুটো লাল টকটকে ফুলে মোড়া পলাশ গাছ। একটা বনমোরগের টকটকে লাল ঝুঁটির মত। তারপর বালির পাড়, বালির ওপর পায়ের ছাপ চলে গেছে জল অবধি, নদীর জল ছলছল করছে। ওপারে নারকোল গাছের সারি ডিঙিয়ে গোলা খয়েরের মত আকাশ।

ইতু হেসে উঠে ওকে থামিয়ে দিয়েছিল।—দ্যাখ রাখী, তোর চোখে রঙ লেগেছে, তাই যা দেখছিস তাই রেনবো কালার।

নন্দিতা সব সময়েই ভীরু ভীরু। ও যেন হাসতেও ভয় পায়। তবু কৌতূহল চাপতে পারেনি। উৎসুক হয়ে বলে উঠেছে, কাছেপিঠে এমন জায়গা আছে? সত্যি বলছিস?

—রিয়েলী, রিয়েলী। রাখী জোর দিয়ে বলেছে, নিজের চোখেই গিয়ে একদিন দেখে আয় না।

ইতু ঠেস দিয়ে বলেছে, আমাদের ভাই বয়ফ্রেন্ডও নেই, বয়ফ্রেন্ডের গাড়িও নেই।

গর্বে আনন্দে রাখীর চোখদুটো হাসি উপছে দিয়েছে।—চাস্ তো বল না, দেবো জুটিয়ে?

ইতু ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গের হাসি টেনে বলে উঠেছে, না বাবা, ওসবে আমার দরকার নেই। ওসব প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না।

তবু জায়গাটা এক অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ওদের বার বার ডেকেছে। ইতুকে, নন্দিতাকে। আর রাখী বার বার বলেছে, বিশ্বাস কর, ও জায়গায় একা একা গিয়ে ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে, সকলে মিলে একদিন গিয়ে খুব হৈ-হুল্লোড় করি।

শেষ অবধি পিকনিকের কথাটা সেজন্যেই উঠেছিল। সেজন্যেই ইতু নিজে রাজী হয়েছিল, নন্দিতাকে রাজী করিয়েছিল। দীপকের সঙ্গে তো ওদের যথেষ্ট আলাপ আছে। কলেজে এসে কতদিন ইতুর কাছেই খবর নিয়ে গেছে রাখীর, মিটমাটের জন্যে ওকেই সাক্ষী ডেকেছে দীপক। একদিন ওয়ালডর্ফে চীনে খাবার খাইয়েছিল, একদিন চা—'গে'তে। দু'দিনই দীপকের বন্ধু অতীশও ছিল। একদিন তাকে হাসতে হাসতে দিব্যি স্নাবিং দিয়েছিল ইতু। তারপর থেকে ওকে দেখলে বেশ মজা পায়, একটুও ভয় করে না। স্নাবিং খেয়ে মুখটা ঝুলে লম্বা হয়ে গিয়েছিল অতীশের, মনে পড়লে নিজের মনেই ও কুলকুল করে হেসে ওঠে।

নন্দিতা প্রথমটা রাজী হয়নি। ইতু তাকে দুই ধমক দিয়ে বলেছে, ইস্কুলের মেয়ের মত হাতে আঁচল জড়ানো ছাড় তো, ওরা কেউ বাঘ-ভালুক নয়।

নন্দিতা ভীতু ভীতু, কিন্তু কথায় কম যায় না। বলেছিল, ওরা নয়—বলে ঘাড় হেলিয়ে চোখের ইশারা ছুঁড়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ বাড়িতে। বলেছিল, দাদা তো নয়, রয়েল বেঙ্গল টাইগার একখানা।

সে-কথা শুনে ওরা সবাই হেসে উঠেছিল। আর রাখী বলেছিল, তুই কি রে।

পিকনিকে যাবো সে-কথা বলবি নাকি বাড়িতে? দুপুরে বেরিয়ে যাবো, আটটা ন'টার মধ্যে ফিরে আসবো একেবারে লক্ষ্মী মেয়ের মত মুখ করে।

শেষ অবধি তাই নন্দিতাও রাজী না হয়ে পারেনি। কতদিন তো নিছক নির্দোষ আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে গেছে, সাড়ে আটটা ন'টাতেও ফিরেছে, তারপর চটপট একটা বানানো গল্প শুনিয়ে দিয়েছে মাকে। নন্দিতার নিজেরই হাসি পায় মাঝে মাঝে। সত্যি, মা ওকে কি ভালই না বাসে, কত বিশ্বাস করে! আর ও যে কত মিথ্যে কথা বলে মাকে, পাপের আর শেষ নেই। রাখী অবশ্য একদিন হেসে বলেছিল, খাঁচার পাখিটি হয়ে থাকবি, মা তোকে ভালবাসবে না কেন! বলে নিজের দুটো হাত ডানার মত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, হাসিতে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, আমার মত উড়তে শেখ, তখন দেখবি মা'র ভালবাসাটাসা সব উড়ে গেছে। তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছে, আমার ভাই, দেরি হলেই, ডোজ ঠিক করা আছে বকুনির।

—কখনো কখনো আমার তো ডবল ডোজও হয়ে যায়। ইতু হেসে বলেছে।

নন্দিতার মা চেঁচামেচি করেন না। থম মেরে থাকেন, মেয়ের চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে ভেতরটা পড়ে দেখার চেষ্টা করেন। সেসময় নন্দিতার ভীষণ ভয় করে, ওর মনে হয় মা বুঝি ভিতর অবধি সব দেখতে পাচ্ছে; রঙিন মাছ-রাখা কাচের বাক্সটার ওপরে টুক করে আলো জেবলে দিলে যেমন সব দেখা যায়—বালি ঝিনুক ডিম-ডিম ছোট্ট মাছগুলোও। তাই এক এক সময় মনে হয়, বাড়িটা এত গোঁড়া না হলেই ভাল ছিল। সব মেয়েরা এত-এত কাণ্ড করে, রেস্টোরেণ্ট-সিনেমা-চিড়িয়াখানা কোথায় না যায়! কত ছেলেদের সঙ্গে মেশে। অথচ নন্দিতার ভাগ্যে এমন একটা দাদা জুটেছে, সব সময় সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। কোথাও ওকে দেখলেই বাড়ি ফিরে উকিলের জেরা। ইতু একদিন বলেছিল, আমাদের শিখাকে একটু এগিয়ে দে-না ওর কাছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নন্দিতাও হেসে ফেলেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাগও হয়েছিল ইতুর ওপর। দাদাকে কেউ আর পাঁচজনের সমান ভাবলে, দাদাকে কেউ ছোট করলে নন্দিতার রাগ হবে না কেন। আসলে দাদার ভয়, ও ছোট্টটি আছে, কখন কি ভুল করে বসে। ধীরে ধীরে তাই শুধু বলেছিল, দাদাকে তোরা একটুও চিনতে পারিসনি। ইতু সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, না রে, সত্যি খুব ভাল, কেমন দাদা-দাদা।

নন্দিতা রাখীর মত হতে চায় না, হতে পারবেও না। তবু রাখীর এই কাউকে কেয়ার না করা, কিছুতে আড়ষ্ট না হওয়া ভাবের মধ্যে কি এক নেশা আছে। নন্দিতার ভীষণ ভাল লাগে ওকে। একবার কোন একটা মিছিলে হাতে পতাকা নিয়ে ওর বুকের ভেতর যেমন খানিকটা সাহস এসে গিয়েছিল, রাখীর কাছে এলেই ওর ঠিক তেমনি হয়। কখনো কখনো ওরও ইচ্ছে করে কাউকে ভালবাসতে। কিন্তু সত্যি ভালবাসা কি এমনি করে আসে নাকি। রাখী নিজে একজনকে ভালবেসেছে, তবু ও বোঝে না। মিথ্যে মিথ্যে অতীশের নাম করে ওকে ঠাট্টা করেছিল। নন্দিতা ওসব চায় না, ও শুধু একটা দিনের জন্যে একটা ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে পালিয়ে যেতে চায়। সেই দ্বীপটা আজকের এই পিকনিক।

ইতু একেবারে অন্যরকম। ওর শুধু দেখে বেড়ানোয় সুখ, কোথাও ধরা পড়তে চায় না, ধরা দিতে চায় না। ওর মধ্যে তাই একটা কিশোর কিশোর ভাব মিশে আছে। রাখীকে একদিন বলেছিল, তুই তো উড়িস ঘুড়ির মত, লাটাই হাতে তোকে ওড়ায় তো দীপক। রাখী হেসে উঠেছিল, তারপর কি মনে হতেই ইতুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়েছে।—আর তুই? হাসি থামিয়ে ইতুকে প্রশ্ন করেছে। ইতু হাতে একটা শব্দ করে তুড়ি দিয়েছে ছেলেদের মত, তারপর মেয়েলী গলাতেই ছেলেদের মতই

বলেছে, আমি ভো-কাট্টা, সুতোফুতো নেই, স্রেফ কাটা ঘুড়ি। নিজের ফুর্তিতে উড়ে বেড়াচ্ছি।

আসলে শাসন-ফাসন একটুও মানতে ইচ্ছে করে না ওর। বকুনি খেয়ে খেয়ে বকুনির ধার গেছে কমে। মা'র তো সবতাতেই নিষেধ, কত আর মানবে ও। তবে রাগ মায়ের ওপর যতখানি তার চেয়ে বেশি পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজনদের ওপর। সবাই যেন ওর গার্জেন। সবারই ওর সম্পর্কে খোঁজ রাখা চাই! একদিন ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে দশটা। খুব বকুনি দিয়েছিল মা, রেগে সেদিন রাত্রে আর খায়নি ও। পরের দিন মা বলেছিল, তুই বুঝিস না কেন, এত রাত করে ফিরলে পাড়ার লোক ভাববে কি। কাল বড়-জা এসেছিল, বললে, এত রাত হলো ইতু এখনো ফিরলো না? তা কত বানিয়ে বানিয়ে সব বলতে হলো ; মা তো হবি একদিন, তখন মায়ের দুঃখ বুঝবি।

শুনে ইতুর মনে হয়েছে এত সব কাণ্ড করার দরকারটা কি। আমার খুশী আমি ঘুরবো বেড়াবো দেরি করে ফিরবো। আমি তো কচি খুকি নই, হারিয়ে যাবো না। আমার যা খুশী আমি তাই করবো। ভো-কাট্টা ঘুড়ির মত যতই ভেসে বেড়াই না কেন, আটটা ন'টার মধ্যে ঠিক তোমার গোয়ালেই তো ফিরে আসছি। ইতু ফিক করে হেসে ফেলেছিল নিজের মনেই—মা বোধহয় ভাবে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছি। ওসব প্রেম-ট্রেম জানা আছে. মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে ইতুকে কেউ ভোলাতে পারবে না।

ওর শুধু নেশা নিষেধের গণ্ডী পার হওয়া। ওর কাছে পিকনিকটা পিকনিক নয়, ছোট্ট একটা বিদ্রোহ। বাড়ির বিরুদ্ধে, পাড়াপড়শীর বিরুদ্ধে, আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে।

আর রাখী এখন ওসব কিছু বোঝে না। ও এখন শুধু একটা নেশার দীঘিতে ডুবে আছে। সব শুনে ইতু বলেছিল, ডুবে আর আছিস কোথায়. বল্ দীঘির ঘাটে বসে আছি। অদ্দূর গেলি বেড়াতে একা-একা, এত রেগুলার ক্লাস করছিস, অথচ প্রোগ্রেস রিপোর্টে এখনো শূন্য।

তৃপ্তিতে রাখীর চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল।—এইটুকুই ভাল. বুঝলি ইতু এই ভাল। সারা পৃথিবীটাই মনে হয় পিকনিকের মাঠ।

হেমন্তের দুপুরে তখন শীত একটু একটু উঁকি দিচ্ছে। হাল্কা রোদ্দুরের আমেজ গায়ে মেখে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল রাখী। এখন দুপুর একটা। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে আবার, কিংবা এটুকু পথ বাসে-ট্রামে চলে গেলেও হয়।

ফুটপাথে সরে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, ইতু কিংবা নন্দিতা কোথাও আছে কিনা। না, নেই। ইতুকে তো ওরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল বিলম্বিতা। ইতুর গড়নটা বেশ দীর্ঘাঙ্গী, সারস-সারস ভাব আছে শরীরে, অর্থাৎ ওদের চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা সে, তাই ক্লাসে অনুরাধা একবার ইতুকে বলেছিল 'লম্বিতা', কিন্তু কোথাও মীট করার কথা থাকলেই ও দেরি না করে আসে না বলে রাখী নাম দিয়েছিল 'বিলম্বিতা'। অভিযোগ করলে ইতু হেসে উঠে বলে, দ্যাখ রাখী, কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা না করলে নিজেকে বড় সস্তা মনে হয়। আসলে ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রাখার তত্ত্ব মানে হয়, কিন্তু ওটা একটা পাগল। সকলকে খারিজ করে করে ও ভাবছে ওর দাম বাড়ছে। বুঝছে না, শেষে নিজেই নিজেকে নীলাম করে দেবে।

সিনেমা হলের সামনে একটা বাস-স্টপ, বাস-স্টপের ছাউনীর নীচে দাঁড়াবার কথা। সেখানে গিয়ে এক মিনিট অপেক্ষা করেই রাখী ভাবলো, হলের ভেতর ঢুকে দেয়ালে ছবি দেখছে না তো! কিংবা নন্দিতা এসে থাকলে হয়তো ওজন নিচ্ছে। নন্দিতার ওজন নেওয়ার বাতিক আছে। সিনেমা হলে টিকিট কাটতে গেলে কিংবা ছবি দেখতে এসে ও পটাস করে ব্যাগ খুলবে, একটা দশ নয়া বের করে ওজন নেবার মেশিনে গিয়ে দাঁড়াবে। লাল-সাদা চাকতিটা থামলেই দশ নয়াটা খাপে ঢুকিয়ে দিয়ে যেই ঝটাং করে শব্দ হবে, টিকিট বেরিয়ে আসবে, অমনি সেটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে। পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে তাই নিজেও দেখবে না তখন।

না, বুকিং কাউণ্টারের আশেপাশে ওরা কেউ নেই।

—লেডী কণ্ডাক্টর বলে একটা ছবি আসছে নাকি রে!

দুটো ছোকরা দেয়ালে সাঁটা শো-কার্ড দেখছিল, দেখছিল মানে আড়চোখে তাকিয়ে রাখীকে দেখছিল। একজনের গায়ে চক্করবক্কর শার্ট, একজনের গালে গালপাট্টা জুলফি। এখন এই এক ফ্যাশন উঠেছে ছেলেদের।

রাখী বুঝলো ওকেই বলেছে, কাঁধ থেকে লম্বা স্ট্র্যাপে ঝোলা লাল ব্যাগটার জন্যে। সঙ্গে কেউ থাকলে ও হয়তো ঠোঁট চেপে হাসতো ; এখন একা, তাই ভিতরে ভিতরে রাগলো, হল থেকে বেরিয়ে এল। ওদের কি বলবে, ম্যাটিনি শো-তে ওরা কলেজ থেকে আট-দশটা মেয়ে লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছে। অনুরাধা হঠাৎ ছেলেদের মত জোরসে শিস্ দিয়ে উঠলো। সে কি হাসাহাসি! রাখী নিজেও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। রাখী ভাবলো, অনুরাধাকেও নিয়ে গেলে হতো। কিন্তু না, দীপকের গাড়িতে বোধহয় আঁটবে না।

রাখী হাত তুলে ইশারা করলো নন্দিতা ট্রাম থেকে নামতেই।

কাছে আসতেই বললে, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। এ কি বেশ করেছিস, কালীবাড়ি যাচ্ছিস নাকি?

নন্দিতা লাজুক হাসলো। টকটকে লাল পাড় একখানা কোড়া শাড়ি পরেছে ও। এমনিতে নন্দিতার গায়ের রঙ একটু শ্যামলা, কিন্তু ওর মুখে চোখে কেমন

একটা শান্ত শ্রী আছে। লাল পাড় শাড়িতে ওকে আরো কোমল আর শান্ত লাগছে।

ঠিক তখনই ইতু এগিয়ে এল, ও কখন বাস থেকে নেমেছে রাখী লক্ষ্যও করেনি। রাখী ভেবেছিল নন্দিতা খুব সেজে আসবে, তাকে এমন ঠাণ্ডা পোশাকে দেখে তাই খারাপ লেগেছিল। দীপক আর তার বন্ধুদের কাছে ওর বন্ধুরা এমন পূজারিণী বেশে গেলে রাখীরই লজ্জায় মাথা কাটা যাবার কথা। ওরা ভাববে কি! যাক্, ইতুকে দেখে ওর মনটা আবার খুশী হয়ে উঠলো।

কিন্তু ইতু রাখীর দিকে ভ্রূক্ষেপই করলো না। একেবারে নন্দিতার সামনে এসে অবাক প্রশংসার চোখ দিয়ে তার আপাদমস্তক দেখলো, চোখ দুটো চোখ নয়, যেন দেয়ালে রঙ বুলোনোর বুরুশ, দৃষ্টিটা একবার ওপর থেকে নীচে নামলো, আবার নীচে থেকে ওপরে উঠলো। ভরা কলসীর মত শব্দ করে হেসে বললে, কি দারুণ লাগছে তোকে নন্দিতা, এক্কেবারে ইনোসেণ্ট সর্সারেস!

তারপর রাখীর দিকে ফিরে বললে, যতই সাজি না আমরা, ছেলেদের কাছে ইনোসেণ্টদেরই ডিম্যাণ্ড।

ইতুর প্রশস্তিতে রাখীও তখন সান্ত্বনা পেয়েছে। ওর রুচি আছে—ইতুর ; আর ও ছেলেদের খুব ভাল বোঝে। তা হলে নন্দিতার জন্যে রাখীর আর খুব একটা অস্বস্তি থাকা উচিত নয়।

ইতুর হাতে একটা ভায়োলেট রঙের কার্ডিগান ভাঁজ করা রয়েছে, কালো ছোপ-ছোপ একখানা ভায়োলেট রঙের শাড়ি পরেছে। ফর্সা রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে ওকে, তার ওপর ইতুর আসল রূপ তো চুলে। বেশ পুরুষ্টু আর কোমরের নীচে অবধি নেমে আসা বেণীতেই তো ওর রূপ। তাছাড়া হাঁটাচলায় ফুর্তির মেজাজে ঐ হরিণ হরিণ ভাব।

নন্দিতার সাজে অসন্তুষ্ট ভাব পুরো কাটেনি বলেই হোক্ কিংবা ইতুর সাজ-গোজে খুশী হয়েই হোক্, ও বলে উঠলো, দারুণ লাগছে তোকে, ইতু। দেখিস, শেষে দীপ যেন...

কলকল করে হেসে উঠলো ইতু।—ভয় নেই, হি'জ টু ডীপ। বলে অর্থপূর্ণভাবে চোখটা কেমন যেন করলো।

রাখী ঈষৎ ভয়ে ঈষৎ কৌতুকে বললে, এই! খবরদার!

নন্দিতা বোকার মত তাকালো একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে, কিন্তু বুঝতে পারলো না।

ব্যাপারটা তুচ্ছ, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক হয়ে যেতে পারে। যদি দীপকের কানে যায়। আর ইতুকে বিশ্বাস নেই। ও কখন যে কি বলে বসে ঠিক নেই তার। অবশ্য ইচ্ছে করে বলবে না কখনো, তা জানে রাখী।

রাখী হঠাৎ হাত তুলে ডবল-ডেকার বাসটাকে থামালো। দুপুরে এসময় তেমন ভিড় নেই। তরতর করে উঠে পড়লো তিনজনই, আর বসার জায়গা পেতেই নন্দিতা দেখলো ইতু-রাখী কি যেন কানাকানি করলো। সমস্ত ব্যাপারখানা তার কাছে রহস্য-রহস্য ঠেকলো। নিশ্চয় কিছু মজার। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে বাধলো। এর আগেও দু'একবার এমন হয়েছে, ওকে বাদ দিয়েই ওরা দু'জনে কানাকানি করেছে, কিংবা কিছু একটা নিয়ে হেসে উঠেছে। অথচ নন্দিতাকে বলেনি। নন্দিতার তখন খুব রাগ হয়, ওদের সামনে ও কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। ওরা তিনজনই তো বন্ধু, তবু মাঝে মাঝে নন্দিতাকে যেন বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখে।

নন্দিতা তাই কোনো কৌতূহলও দেখালো না। অনেকদিন আগে একবার শুধু খুব অভিমান হয়েছিল, সুমিকে বলেছিল, সমান সমান বড়লোক না হলে ভাই সত্যি

বন্ধু হয় না। বলেছিল বটে, তবে নন্দিতা জানে, ও গরীব হলেও রাখী-ইতুরা মোটেই বড়লোক নয়। তবু ওদের দু'জনকে ফিসফিস করে কথা বলতে, হেসে উঠতে দেখে নন্দিতার মন খারাপ হয়ে গেল। ও ভাবলো, আমি তো যেতে চাইনি, রাখীই জোর করেছিল। ও ভাবলো, যেতে রাজী না হলেই পারতাম।

রাখীর ওসব ভাবনা নেই, নন্দিতা কি ভাবছে না ভাবছে দেখার চোখ তখন তার কৌতুকে হাসছে।

আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। দীপককে তার বন্ধুরা ডাকে 'দীপ' বলে, তা থেকে রসিকতা করে রাখী নিজেও একদিন তাকে দীপ বলে ডেকেছিল। তারপর তো কি ভাবে কি-সব হয়ে গেল মনের মধ্যে, দীপক দু'-দু'খানা লম্বা চিঠি লিখে ফেললো রাখীকে। তারপর আরো লিখেছে। কিন্তু সব ক'খানার শেষেই নাম লিখেছে ইংরেজীতে—' Deep ' বলে। একটার শেষে—Too Deep.

আসলে সেটাও কিছু নয়। আসলে অপরাধ দীপকের চিঠিগুলো ইতুকে দেখানোয়। দীপক চিঠিতেও লিখেছে, ওকে বার বার মুখেও বলেছে, দীপকের চিঠি যেন কাউকে না দেখায় রাখী। ওদের মধ্যে কি কথা হয়, দীপক ওকে গাঢ় গলায় কবে কি বলেছে, এ-সব যেন কেউ না জানে। রাখী কথা দিয়েছে, বার বার বলেছে, দেখাই না দেখাই না। বলি না বলি না। একদিন অভিমানে চোখ ছল ছল করে বলেছিল, তুমি আমাকে ভীষণ সন্দেহ করো দীপ, এতই যদি সন্দেহ, আর কোন-দিন বিরক্ত করবো না তোমাকে।

—সন্দেহ? অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপক।—এর মধ্যে সন্দেহের কি আছে!

রাখী জলে ভেজা চোখের পাতাকে হাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, বলেছি তো, কাউকে কিচ্ছু বলি না, কাউকে তোমার চিঠি দেখাইনি।

অথচ ইতুকে সব চিঠি দেখিয়েছে ও, না দেখিয়ে পারেনি। যত কথা হয়েছে তার সবই প্রায় বলে ফেলে। ফেলেছে। না বলে না দেখিয়ে সত্যি আনন্দ নেই। আর ইতু তো ওর দারুণ বন্ধু, তাকে দেখালে বা বললে দোষ কি। দীপক হয়তো ভাবে, ওর চিঠি বন্ধুদের দেখিয়ে ও হাসাহাসি করে। কিংবা দীপটা ভীষণ ভীতু, ভাবে, গোপন কথা সব ইতুটিতুকে বললে ওরা ভাংচি দেবে, দীপকের বিরুদ্ধে ওর মনকে বিষিয়ে দেবে।

ও তাই বার বার ইতুকে সাবধান করে দিয়েছে, দীপক যেন জানতে না পারে। জানলে সেই মুহূর্তে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

—তা বলে কিছুই কি আর বলিনি ওদের? একদিন হাসতে হাসতে রাখী বলেছে দীপককে।

দীপকের তখন হারাই-হারাই ভয় কেটে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে, কি বলেছো?

—যেটুকু না বললে নয়। রাখী দীপকের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিয়েছে।

সেদিন থেকেই ইতু ওদের দু'জনের মাঝখানে উঁকি দিয়েছে। সত্যি সত্যি একটা ছবি আছে ওদের তিনজনের। রাখী আর দীপকের—পিছন থেকে ইতু মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসছে।

—হাসি থামাও, নামতে হবে না বুঝি! ওদের দু'জনকে হাসতে দেখে নন্দিতা বলে উঠলো। কারণ বাস তখন গ্র্যান্ড হোটেল পার হয়ে গেছে।

চমকে জানালার বাইরে তাকালো রাখী। বাস স্টপে পেঁাছতেই হুড়মুড় করে নেমে পড়লো। পিছনে পিছনে ইতু আর নন্দিতা।

মেট্রোর নীচে ওদের অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু কি হবে অতখানি গিয়ে। তার চেয়ে এপারে যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করা আছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক্।

এখানেই গাড়ি রাখার কথা।

ইতু বললে, নম্বর মনে আছে তোর?

রাখী হেসে ঘাড় নাড়লো। একবার এদিক থেকেই মেট্রোর নীচেটা দেখলো, চোখ বুলিয়ে গেল সাদা অ্যামবাসাডর গাড়ি ক'খানার ওপর দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনকেই দেখতে পেল। দীপক, অতীশ আর সোমনাথ।

সোমনাথকেও দীপক টেনে আনবে রাখী ভাবেনি। ওর ধারণা ছিল, শুধু অতীশ আসবে ওর সঙ্গে।

সোমনাথের সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী আর সাদা পাজামা, সদ্য ভাঙা।

রাখী ফিসফিস করে বললে, ঐ সোমনাথ, যে টিনোপলের বিজ্ঞাপন হয়ে এসেছে। তোদের সঙ্গে আলাপই হয়নি।

ইতু হেসে বললে, দীপকের বেশ ম্যাথমেটিক্যাল ব্রেন আছে রে, যোগে ভুল করেনি...থ্রি ফর থ্রি।

নন্দিতা নতুন মুখ দেখে একটু জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে ইতুকে বললে, তুই কি বেহায়া বাবা!

ছ'-ছ'টা দুঃসাহসের মুখ এতক্ষণ টাটকা লাগছিল, গাড়িতে উঠেই বাসী হয়ে গেল। না, দীপকের বরং ভয়ডর একটু কম। রাখী আর ইতু তবু মুখ দুটো ব্রাইট রাখবার চেষ্টা করলো, নন্দিতা তো ভয়েই জড়োসড়ো। চেনাজানা কেউ কোথাও আছে কিনা তাকিয়ে দেখারও সাহস হলো না তার। দাদা আবার এদিকেও মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করে।

ওদের দূর থেকে আসতে দেখেই চাবির রিংটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দীপক এগিয়ে গিয়েছিল। চেনে বাঁধা ওর এই চাবির রিংটা যেন বুকের মেডেল।

যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে বাঁ হাত ট্রাউজার্সের পকেটে গুঁজে ওকে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসতে দেখে ইতু বলে উঠেছিল, দীপ কিন্তু দারুণ স্মার্ট, না রে রাখী!

—আস্তে। শুনলে আর গর্বে মাটিতে পা পড়বে না। রাখী ফিসফিস করে বলে হেসে উঠেছিল।

দীপক্ কাছে থাকলে ও এমনিতেই একটা রানী-রানী ভাব করে। সাদা অ্যামবা-সাডর গাড়িটার কাছে এসে রাখী আরো সপ্রতিভ ভংগীতে সোমনাথের সংগে নন্দিতার আলাপ করিয়ে দিল।—এ নন্দিতা, আর...নন্দিতা ঠোঁটের কোণে এক টুকরো স্মিত হাসি এনে চোখ তুলে সোমনাথের চোখে একবার তাকালো, তারপর চোখ নামালো। নমস্কার করতেও ভুলে গেল ও।

এদিকে ইতুর পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই ইতু নিজেই বলে উঠলো, আমি ইতু সান্যাল, পাঁচ ফুট পাঁচ, অনার্স ছিল হিস্ট্রিতে, রাখীর অনেকদিনের বন্ধু।

দীপক ততক্ষণে স্টিয়ারিঙের সামনে গিয়ে বসেছে। কিন্তু অতীশ আর সোম-নাথকে ওর পাশে এসে বসতে দেখেই ও দরজা খুলে নেমে পড়লো।—আমি কি মেয়ে-স্কুলের বাসের ড্রাইভার নাকি!

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অতীশ বললে, সাদা কথাটা স্পষ্ট করেই বল না। লেডীবার্ডকে পাশে বসতে হবে, এই তো!

রাখীর নিজেরও সেই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু লজ্জা পেয়ে ও রেগে গেল।—কক্ষনো না, কক্ষনো না।

জেদ ছাড়ল না ও কিছুতেই। তা দেখে ইতু বললে, কি মশাই, আমি গিয়ে বসলে হবে? এ যাত্রায় নয় স্ট্যান্ডবাই হিসেবেই চালিয়ে দিই।

রাখী ওর কথায় মৃদু হাসলো, চোখের ইশারায় ওকে উসকে দিল, যা যা।

শেষ অবধি তাই ঠিক হলো। সামনে অতীশ আর দীপকের মাঝখানে ইতু। পিছনে রাখী, নন্দিতা সোমনাথ।

রাখী আড়চোখে দেখলো, ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেমন নন্দিতা বসেছে, তেমনি বিঘত-খানেক ফাঁক রেখে ওপাশে সোমনাথও জড়োসড়ো।

গাড়ি স্টার্ট নিল। আর সংগে সংগে সব ক'টা দুঃসাহসের মুখ কেমন ম্লান দেখালো। নন্দিতার তো কথাই নেই, ইতুও যেন জোর করে হাসার চেষ্টা করছে।

গাড়ি যতক্ষণ না হাওড়া ব্রীজে উঠেছে তখন অবধি রাখী, ইতু, নন্দিতার মুখে কোনো কথা নেই। কেবল এপাশ ওপাশ দেখছে, চেনাজানা কেউ না দেখে ফেলে। রাস্তাঘাটে বা রেস্টোরেণ্টে দেখলে তেমন ভয় নেই। কিন্তু দীপকের গাড়িতে

এবং এদিকের রাস্তায়, কি অজুহাতই বা দেবে ধরা পড়লে!

রাখী অবশ্য ওসব কথা ভাবছেই না। ওর মন তখন বাড়িতে ফিরে গেছে। সমস্ত ঘটনা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সমস্ত মন বিস্বাদ।

রাখীর এক এক সময় মনে হয় দোষ ওর নিজেরই। সব বিষয়ে ওর ইচ্ছেগুলো এত স্পষ্ট কেন। তা না হলে বাড়িটার সঙ্গে ও নিশ্চয়ই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো। অনুরাধা একদিন ওদের বাড়ি এসেছিল। ফেরার পথে বলেছিল, তোর বাবা-মাকে দেখলে একেবারে ইয়াং মনে হয়। তুই খুব লাকি। রাখীর নিজের কিন্তু তা মনে হয় না। ওর ইচ্ছে করে বাবা বাবার মত হবে, অর্ধেক চুল পাকা, একটু ভালমানুষ ভালমানুষ। ওর ইচ্ছে করে মা অত সাজগোজ করবে না, অত রঙিন শাড়ি পরবে না। শুধু ব্যবহারে, শুধু পোশাকে মডার্ন হয়ে কি লাভ, মন যদি বিধবা পিসীটার মতই হয়! রাঙা পিসী মাঝে মাঝেই শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে দু'তিন মাস জাঁকিয়ে বসে। আর সে-সময় সর্বক্ষণ তার রাখীর ওপর গোয়েন্দাগিরি। সব সময়ে মাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছে কি করে মেয়েকে ঠিকপথে রাখতে হয়। যেন রাখী খুব একটা অন্যায় করছে, পাপ করছে। কি, না কলেজের ছেলেদের সঙ্গে মেশে। কে মেশে না! পিসী সেই নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতেই পড়ে আছে। মা বাইরে সেন্ট পার্সেন্ট আধুনিকা, কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কি গল্প হলো, কে কি মজার কথা বলেছে, প্রথম দিকে শুনে হাসতো। এখনো অবশ্য খুব বেশি মাইন্ড করে না। কিন্তু দীপকের নাম ও আর ভুলেও মা'র সামনে তোলে না। অথচ দীপ তো দিব্যি ভাল চাকরি করে, কত ভদ্র আর স্মার্ট।—বলছিস তো তোদের চেয়ে বড়, চাকরি করে। কি করে আলাপ হলো? মা জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আর উপায় কি, বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলেছিল, অবহেলার ভঙ্গীতে। যেন দীপক বিশেষ কেউ নয়। তারপর যেদিন শুনলো দীপকের একটা গাড়ি আছে সেদিন কেমন দৃষ্টিতে যেন মা তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। যেন গাড়িওয়ালা লোকগুলো ভাল হয় না। অথচ রাখী জানে, গাড়ির ওপর ফ্রীজের ওপর মা'র নিজেরও লোভ। বাবাকে কতদিন খোঁটা দিয়েছে।

মাকে এক এক সময় ওর বন্ধু মনে হয়, সব কথা বলা যায়। না, আসল কথাগুলো ছাড়া। এখন তো বাড়িতে শুধু মিথ্যে কথা আর মিথ্যে কথা। ইতু-অনুরাধার সঙ্গে একদিন থিয়েটার দেখতে গেল, দীপক-টীপক কেউ ছিল না, তবু মাকে বলতে হলো লাইব্রেরী যাচ্ছি।

—সে কি রে, আমাদের সঙ্গে গেলেও আপত্তি হবে নাকি? অনুরাধা বলেছিল।

রাখী হেসে বলেছিল, কি করি বল, কাল যে ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে তোদের নাম অলরেডি চালিয়ে দিয়েছি। ফিরতেই একেবারে পিসীর সামনে, উপায় কি!

মাথার ওপর সর্বক্ষণ একটা মিথ্যের পৃথিবী বয়ে বেড়াতে হয় বলে এক এক সময় রাগ হয়, আবার সে-সব কথা বন্ধুদের বলার সময় বেশ মজাও পায়।

দীপককে বলেছিল একদিন, তোমার জন্যে কত অজুহাত আর দেবো!

বলে, কবে কি বলেছে মা'কে, কি রকম অভিনয় করেছে, হাত-পা নেড়ে দেখিয়েছিল।

দেখে দীপকও হেসে উঠেছে, আবার ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেছে, তা হলে অভিনয় তুমি ভালই জানো, কি বলো!

ব্যস্, রাখী কড়া চোখে তাকিয়েছে দীপকের দিকে।—ঠিক আছে। বলে তখনই দরজা খুলে নেমে পড়ে আর কি!

নেমে ও পড়তো না, ঠিকই ফিরে আসতো, হয়তো প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠতো

ফিরে এসে। তবু মাঝে মাঝে একটু অভিমান দেখাতে বেশ ভালই লাগে।

আসলে দীপক সম্পর্কে ও মনে মনে প্রায় ঠিক করে ফেলেছে। আজ বাড়িতে এতখানি রাগারাগি হয়ে যাওয়ার মূল কারণই তাই।

সমস্ত ষড়যন্ত্রটা আসলে পিসীর। বাবা-মা'ও নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা করেছে, চিঠি লেখালিখি করেছে, অথচ রাখী ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

মা সকালে হঠাৎ বললে, কালকের দিনটা কিন্তু তুই বাড়ি থেকে বেরুবি না।

—কেন মা? বুঝতে না পেরে রাখী প্রশ্ন করেছিল।

মা এড়িয়ে যাচ্ছিল।—তোর বাবা বলেছে, কি কাজ আছে।

কিন্তু রাঙাপিসী চুপ করে থাকার লোক নয়। দুম্ করে বললে, কেন আবার, তোকে দেখতে আসবে।

রেগেমেগে সে এক তুলকালাম কান্ড করে বসলো রাখী। মা কড়া কড়া কথা বললো, পিসীর মুখে কোনো লাগাম নেই, বলে বসলো, ফাস্টিনস্টি করেই সারাজীবন কাটবে!

দেখতে আসার কথাতেই ওর ভীষণ অপমান বোধ হয়েছিল। ক্লাশের একটা মেয়ের সম্পর্কে এমনি একটা খবর জানতে পেরে দল বেঁধে তার পিছনে লেগেছিল একবার, বন্ধুদের বলেছিল, চেনা নেই জানা নেই একটা লোককে বিয়ে করা! ইম্পসিবল্। সেই রাখী কিনা 'হাঁটো তো মা একটু', 'দেখি তো মা চুলটা'—অ্যাবসার্ড। সমস্ত মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে। ইতু অনুরাধা যদি জানতে পারে মুখ দেখাতে পারবে না ও।

সকালের সেই দৃশ্যটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল রাখী। গাড়ির জানালার পাশে বসেও বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। একবার শুধু মনে হয়েছিল, ছেলেটি কেমন দেখতে, কি করে, মাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলে হতো। ঝগড়া করে ফেলার পরের মুহূর্তে ওর খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

অতীশের কথায় ঘোর কেটে গেল। অর্থাৎ অতীশের কথায় সকলে শব্দ করে হেসে উঠতেই ও নিজের মধ্যে ফিরে এল। জিজ্ঞেস করলে, কি কথা, কি বললেন?

রাখীকে নিয়েই মন্তব্য। রাখী শোনেনি বলেই ওরা আবার হেসে উঠলো।

দীপক যত অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিচ্ছে, কোলকাতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন হাইওয়েতে পড়ে গাড়ি যত স্পীড নিচ্ছে ততই যেন উদ্দাম হয়ে উঠছে ওরা। উচ্ছল অর্কেস্ট্রার মত ওদের হাসিহুল্লোড় কথা যেন নেশায় মেতে উঠলো।

ইতুর হয়তো বসতে অসুবিধে হচ্ছিল, হাত দুটো গুটিয়ে রাখতে। তাই ডান হাতটা দীপকের পিঠের দিকে সীটের ওপর রাখলো, বললে, দেখিস রাখী, জেলাসি হচ্ছে না তো তোর?

রাখী পিছন থেকে বললে, হতেও পারে, বাঁ হাতটা বরং...

ইতু সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা নামিয়ে বাঁ হাতটা অতীশের কাঁধের দিকে সীটের ওপর রাখলো। বললে, বেশ তো, তাই রাখলাম। তারপর অতীশের দিকে মুখ না ফিরিয়েই সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়েই বললে, দেখবেন স্যার, আপনার আবার বুকের মধ্যে কি সব হয়-টয় শুনেছি, সে সব যেন না হয়।

অতীশ হেসে বললে, পাশে বসেই হচ্ছিল, এখন তো কাঁধটা কেমন সিড়সিড় করছে। নেহাত অ্যামবাসাডর, তা না হলে আপনার হাতের ছোঁয়াটাও পেতাম।

—আহা অচ্ছুত থাকবেন কেন! বলে বাঁ হাতে অতীশের ঘাড়ের চুলগুলো মুঠো করে ধরে ঝাঁকানি দিল ইতু।

রাখী পিছন থেকে ফোড়ন কাটলো, বাঃ, এই তো বেশ প্রগ্রেস হচ্ছে। আশা

ছাড়বেন না অতীশদা।

দীপক তখন স্টিয়ারিং ধরে মুচকি মুচকি হাসছে।

কখনো গান, অবিরাম হাসি—কথা, ছোট ছোট স্মৃতির টুকরোকে রেকর্ড প্লেয়ারে চাপিয়ে নতুন করে বাজানো, 'অনুরাধা এলে আরো জমতো', 'ভয় নেই ভয় নেই রাখী, ওখানে পেঁছে তোদের একা ছেড়ে দেবো' —একটা ফূর্তির বন্যা যেন হাইওয়ে ধরে সব দুঃখ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

অতীশ অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বললে, কোথাও একটু চা খেলে হতো রে।

তখনো বেশ কিছুটা বাকি। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে গাড়ি থামাতে হলো।

ইতুর ডান হাতের কব্জিতে অতিরিক্ত চওড়া চামড়ার ব্যান্ডে ঢাউস একটা ঘড়ি। গাড়ি চলছে আবার। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ ইতু ঘড়ি দেখলো। দীপকের তা চোখ এড়ালো না। বললে, আর এসে গেছি।

রাখী যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি তুললো, এসে গেছি।

লাভলি, লাভলি! ইতু সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললে, এমন একটা সুন্দর জায়গা আছে, এত কাছে, জানতামই না।

অতীশ বললে, আরো সুন্দর একটা জায়গা আছে, আরো কাছে, আপনি তো জানতে চান না।

এবার আর কেউ হাসলো না। কারণ তখন সবারই চোখ জুড়িয়ে গেছে।

হাইওয়ের চওড়া রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ব্রীজের ওপর দিয়ে। কিন্তু তার আগেই ডান দিকে একটা সরু কাঁচা রাস্তা নেমেছে সবুজ ঘাসের দ্বীপটুকুর মধ্যে। এরকম সবুজ যেন ওরা অনেক কাল দেখেনি। কাঁচা সোনা রোদ্দুরে এ সবুজ যেন অন্যরকম। আর অফুরন্ত গাছ, গাছ, যেন বন হয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায় বালির চর, জল, জল, হলুদ রোদ্দুর, ফিকে নীল আকাশ।

সবুজ দ্বীপের মত জায়গাটায় আরো দু'খানি গাড়ি দেখতে পেল দীপক। একখানা ফিয়াট। বড় রাস্তা থেকে নেমে ওর গাড়িও সেদিকেই এগিয়ে গিয়ে থামলো। চারদিকের চারটে দরজা একই সংগে খুলে গেল। ওরা সবাই নেমে পড়লো।

আঃ! একটা আরামের নিঃশ্বাস নিল ওরা। এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে হাত-পা জমে গেছে। এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে হবে।

দীপক দু-পা এগিয়েই নরম ঘাসের ওপর ধপ্ করে বসে সটান শুয়ে পড়লো। অতীশ আর সোমনাথ পায়চারী 'করার নাম করে অন্য গাড়ি দুটোর কাছ দিয়ে ঘুরে আসতে গেল। আর রাখী, ইতু, নন্দিতা ফিসফিস করলো, চেনা কেউ নেই তো রে! ওরা দুটো দলকেই দেখে নিশ্চিন্ত হলো। ব্যস, এবার ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারবে। এবার নিশ্চিন্তে এই আনন্দটুকু উপভোগ করতে পারবে।

দীপক শুয়ে শুয়েই অতীশকে ডাক দিল। গাড়ির চাবিটা প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করে বললে, পিছনে কেরিয়ারটা খুলে দে, মাংসটা ডবল সেদ্ধ হয়ে যাবে হয়তো।

অতীশ ফিরে আসতেই সোমনাথ থেমে পড়লো। ও চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। জায়গাটা এখনো পিকনিকের জন্যে তেমন পপুলার হয়নি। তবু রাস্তার ধারে চিকের দেয়াল আর হোগলার ছাউনী দেওয়া খানকয়েক চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে। দু-একজন একরাশ ডাব নিয়ে বসেছে। ওদিকের গাছতলা থেকে ট্রান্সিসটারের গান ভেসে আসছে। ময়লা ইজের-পরা খালি-গা কালোকুলো আধ ডজন বাচ্চা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। একজন ওদের দিকেই ছুটে এল।— চা এনে দেবো বাবু!

সোমনাথ একটু শান্তশিষ্ট, বেশি কথা বলে না। দীপক লক্ষ্য করেছে আসার পথে সারাক্ষণ সকলে গল্প করেছে, এমন কি নন্দিতাও দু-একটা মজার কথা বলেছে, কিন্তু সোমনাথ শুধু হাসিতে যোগ দিয়েছে, আর কিছু নয়। এমন লাজুক আর মুখচোরা বন্ধুটিকে নিয়ে দীপকেরই মুশকিল। অথচ মেয়েরা কেউ না থাকলে এই সোমনাথই অন্য মানুষ। তখন পাজামা পাঞ্জাবীতেও ওকে কবি-কবি লাগে না।

শুনে রাখী হেসে উঠেছিল একদিন।—আজকালকার কবিদের সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। ওদের দেখে অন্য অনেক কিছু মনে হবে, কিন্তু কবির লেবেল কোথাও খুঁজে পাবে না।

রাখী ঐসব কবিদের মিটিং-ফিটিঙে দু-একবার গিয়েছিল, গম্পটম্প পড়ে।

দীপকের ওসব ন্যাকামি ভাল লাগে না। ওর একটাই নেশা—ক্রিকেট। শুধু দেখার নয়, নিজেও ভাল খেলতে পারে, অন্তত অতীশ তাই বলে।

অতীশ গাড়ির দিকে যেতেই সোমনাথ নিজেকে একা একা বোধ করলো। ধীরে ধীরে এসে দীপক যেখানে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে, সেখানেই স্যাণ্ডেল খুলে তার ওপর বসলো। সেখানটায় সামনের গাছটার ছায়া পড়েছিল।

ওদিকে কেরিয়ার খুলে দিতেই বেশ ভুরভুরে রান্না-করা মাংসের গন্ধ এল। একটা চেনা রেস্টোরেণ্ট থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে এনেছে দীপক আর অতীশ।

রাখীদের দল ততক্ষণে ঘুরে ঘুরে অন্য দুটো দলকে পার হয়ে নদীর ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছে।

অতীশ ফিরে এসে বললে, কি ব্যাপার, সব আলাদা আলাদা হয়ে গেলাম যে!

দীপক উঠে বসে বললে, চল, একটু সার্ভে করে আসি।

বলেই উঠে পড়লো।

ইজের-পরা বাচ্চা ছেলেটা বললে, চা আনবো বাবু!

দীপক বললে, এখন না। অর্থাৎ, ওরা ফিরুক আগে।

ছেলেটা খুশী হয়ে একটু সরে দাঁড়ালো।

তিনজনেই এমন ভাব করে হাঁটতে হাঁটতে অন্য দল দুটোর দিকে গেল, যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই, এমনি।

একটা দল ফ্যামিলি। স্বামী, স্ত্রী, একটা বছর পনেরোর স্ল্যাক্স্ আর ঢিলে কুর্তা, একটা বছর চার।

একটু এগিয়ে আরেকটা দল। দল নয়, দু'জন। দুজনেরই বয়স কম, দীপক-রাখীদের মতই। তবে নতুন বিয়ে হয়েছে, বউটার সিঁথিতে চওড়া জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখে মনে হলো।

রাখীরা আড়াল থেকে উঠে আসছে দেখেই দীপকরা গাছতলাটায় ফিরে এল। নিজের মনেই বললে, এ জায়গাটাও একটা পিকনিকের জায়গা হয়ে যাবে দেখিস। এর আগে যখন এসেছিলাম, সেবার কেউ আসেনি। দোকান ছিল একটাই।

অতীশ বললে, স্ল্যাক্স্-পরা মেয়েটা দিব্যি দেখতে। তবে বড্ড বাচ্চা।

দীপক বললে, ক্ষুদে বৌটা খুব মিষ্টি।

সোমনাথ কোনো কথা বললো না, শুধু হাসলো।

রাখীরা তিনজন তখন এ-ওর গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে একটা উচ্ছল হাসির ঢেউ হয়ে ফিরে আসছে।

রাখী আর নন্দিতা ফ্যামিলি গ্রুপটার কাছে থেমে পড়লো। চার বছরের বাচ্চা ছেলেটা রবারের বল খেলছিল, রাখী গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল।

ইতু এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখে দীপকের কাছে চলে এল। অতীশের সামনে বসে পড়ে বললে, কি মশাই, আরো সুন্দর জায়গাটায়গা কি বলছিলেন তখন, দেখাবেন তো?

অতীশের মনে পড়লো, গাড়ি থেকে নামবার সময় ও কি বলেছিল। 'আরো সুন্দর একটা জায়গা আছে, আরো কাছে, আপনি তো জানতে চান না।'

দীপক হাসলো। অতীশ একদিন কি করেছিল শুনুন। বাসে যাচ্ছি, প্রাইভেট বাসে, নামবার সময় চিৎকার করে উঠলো, জেনানা হায়, রোখকে। পাঞ্জাবী কণ্ডাকটারও রসিক, জিজ্ঞেস করলে, কাঁহা হায় জেনানা? অতীশ নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললে, ইধার।

ওরা সব ক'জন হেসে উঠলো। অতীশ নিজেও।

ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রাখী এসে হাজির হলো। —কি যেন মিস্ করে গেলাম মনে হচ্ছে।

ইতু বললে, নির্জনতা। বলে হেসে উঠলো।

নন্দিতাও ধীর পায়ে এল, বসবে কি বসবে না এমনি এক অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে রইলো। সোমনাথ চোখ তুলে একবার তাকালো তার দিকে, চোখ নামালো, তারপর নন্দিতাকে বলতে সঙ্কোচ হলো বলে রাখীকে উদ্দেশ করে বললে, বসুন না আপনারা।

নন্দিতা বোধহয় বুঝতে পারলো, ও একটু দূরত্ব রেখে বসে পড়লো।

ওর ভীষণ ভাল লাগছিল। না, সোমনাথের জন্যে নয়। রাখী, ইতু এই একটু আগে সোমনাথকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে ওর সঙ্গে। ওকে ছুঁয়ে ফেলার ভয়ে সোমনাথ গাড়িতে কি-রকম জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল, সে-কথা বলে নন্দিতা নিজেও হেসেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ও প্রেমট্রেম করার জন্যে তখন ছটফট করছে না। এর আগেও দু-একবার তো সুযোগ এসেছিল। অনেকদিন আগে।

নন্দিতার আসলে ভাল লাগছে একটা নতুন জায়গায় আজ বেড়াতে এসেছে বলে। একঘেয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে। ওর এক-এক সময় মনে হয়, ওর মত একঘেয়ে নীরস জীবন আর কারো নয়। মা'র চেয়ে নন্দিতার বাবা আরো গোঁড়া, দাদা ওর কাছে একটা অস্বস্তি। অথচ যখন স্কুলে পড়তো দাদা কত ভালবাসত ওকে। ও যত বড় হয়েছে দাদার গার্জেনি ততই বেড়েছে। শুধু ছেলেদের সঙ্গে মিশলে যদি তার আপত্তি হতো ক্ষতি ছিল না। তা নয়, মেয়েদের কে ওর বন্ধু হবে কে হবে না, তাও যেন দাদার কাছে পার্মিশন নিতে হবে। পার্ট ওয়ান পড়ার সময় নীলা ওর বন্ধু হয়েছিল, একদিন বাড়িতে এসেছিল। খুব কালো আর রোগা ছিল মেয়েটা, বেশ গরীবও। কিন্তু মন ছিল ভীষণ সাদা। দাদা সেদিন রাত্তিরেই বললে, তোর কি যত সব ছোটলোক বন্ধু, ওটার সঙ্গে মিশিস না। নন্দিতা সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিল। মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি, মনে মনে দাদার ওপর রেগে গিয়েছিল শুধু। সব জানি, সব জানি, তুমি আমার একটা সুন্দর বন্ধু চাইছো, যে আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসবে। রাখী যেদিন প্রথম এল বাড়িতে, দাদা হেসে হেসে দু-একটা কথা বললো, সেদিন নীলার কথা ওর মনে পড়েছিল।

বাড়ির শাসন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরে তাই ভাল লাগছিল নন্দিতার। পুজোর সময় রাত দশটা অবধি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পেরে যেমন ভাল লাগে।

এক-এক সময় ওর দম বন্ধ হয়ে আসে।

কোথাও যেতে পাবে না, কোথাও যেতে পাবে না। মেয়ে যে। সবাই যেন ওর জন্যে ওত পেতে বসে আছে, পৃথিবীর সব পুরুষগুলো যেন ভয়ঙ্কর এক-একটা জন্তু। বাবা দাদা তাই মনে করে। অথচ সেবার ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে সবুজ শার্ট ফরসা ছেলেটা একবারও ওর সঙ্গে চোখাচোখি তাকালো না।

ও কলেজে পড়বে, পাশ করবে, তারপর—তারপর নন্দিতা জানে আর কিছু ঠিক নেই, শেষ অবধি সেই একটা চাকরির জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কারণ ও যত বড় হচ্ছে, বাবা-মাকে ততই অসহায় মনে হচ্ছে। আগে মা তবু বাবাকে বিয়ের কথা বলতো, এখন আর তাও বলে না।

নন্দিতা অবশ্য প্রেম কিংবা বিয়ের জন্যে কাঙাল নয়। কখনো-সখনো ট্রামে-বাসে এখানে ওখানে ঝকঝকে কোনো যুবক চেহারার কাউকে দেখলে ভাল লাগে। রাখী তো দিব্যি প্রেম করছে, এখনো বলে ওঠে, ফাইন দেখতে রে ছেলেটা ; কিংবা বাঃ, বেশ লম্বা তো!

কিন্তু ঐ অবধি, তারপর সেই গন্ডীর মধ্যে বাঁধা।

দাদা একবার তার বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেল, নন্দিতার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। ও কখনো সমুদ্র দেখেনি। দাদা ফিরে এল, ওর জন্যে শুধু একটা মোষের শিঙের কলম। পাশের বাড়ির মাসীমা সকলকে নিয়ে একবার দার্জিলিং গেলেন, মাকে বললেন, নন্দিতা চলুক না, ওর তো কোথাও যাওয়া হয় না। মা বললে, কলেজ খুলছে ওর। অর্থাৎ মা'র আপত্তি আছে। স্কুল থেকে একবার মেয়েদের রাঁচি নিয়ে গেল, তখন না-হয় ও ছোট, কিন্তু কলেজের মেয়েদের আগ্রা যাওয়া...তাজমহল দেখার এত ইচ্ছে ওর, বাবা বললে, না-না, যেতে হবে না। কোথাও ওরা নিজেরা যাবে না, টাকার অভাব। কোথাও ওকে যেতে দেবে না, সব সময় ওদের একটাই ভয়।

আজ তাই একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে একটা নতুন জায়গা দেখতে পেয়ে ওর ভীষণ ভালো লাগছে।

এই একটু আগে ওরা তিনজন যখন কোমর ধরাধরি করে আড়ালে চলে গিয়েছিল —রাখী, ইতু আর ও—তখন রাখী বলেছিল, সোমনাথ বোধহয় তোর প্রেমে পড়ে গেছে, নন্দিতা।

ইতু হেসে উঠে বলেছিল, আমি ভাই আজকে অতীশকে একটু আস্কারা দেবো!

প্রেম আর প্রেম। কিংবা বিয়ে। এছাড়া ওদের আর কোনো ভাবনা থাকতে নেই। আর কোনো আনন্দও নেই।

সত্যি, ছেলেরা কত লাকি। ওদের পৃথিবীটা কত বড়। মারপিট করে ওরা সিনেমায় লাইন দেয়, খেলা দেখে, পার্কে কিংবা রাস্তায় ক্রিকেট খেলে, রাত এগারোটা অবধি আড্ডা, আজ পিকনিক, কাল দিল্লী-জয়পুর বেড়াতে যাওয়া। ওদের সবচেয়ে বড় যাবার জায়গা—রাজনীতি।

আমাদের কী আছে, নন্দিতা মনে মনে ভাবলো।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। রাখী বলেছিল। ও জানতো না রাখীও ওর মতই অসুখী। তখন তো দীপকের সঙ্গে আলাপই হয়নি ওর। একটা হতাশার সুর বেজেছিল রাখীর কথায়।—জানিস নন্দিতা, আমার ইচ্ছে করে দারুণ একটা প্রেম করে ফেলি। কেন জানিস, প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো যাবার জায়গা নেই।

বাচ্চা ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে ওরা তখন সকলেই মেতে উঠেছে। কাড়াকাড়ি করে কাছে ডাকছে সবাই। বাচ্চাটা কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছে না, দিব্যি হাসছে, কুটুস কুটুস করে কথা বলছে। নিজেই নিজের নাম বলছে, টমটম। ছেড়ে দিলেই ছুটে বেড়াচ্ছে।

ইতুর ব্যাগের মধ্যে টফি ছিল, ও এনে দিল একটা। ব্যস্, তারপর টমটম কেবল ইতুর কাছে যেতে চাইছে।

দীপক বললে, যেতে তো চাইবেই, ঘুষ দিয়ে বশ করেছেন ওকে।

ইতু বললে, জানি জানি, ছেলেরা সব ঘুষের কাঙাল। মাইনে-টাইনে ওদের কাছে কিচ্ছু না, উপরি পেলেই হলো।

রাখী লজ্জা পেল, দীপক-অতীশদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না, ও মাথা নীচু করলো। এর আগে একদিন দীপক আর ও গড়ের মাঠে অন্ধকারে বসে বসে গল্প করছিল। দীপকের কাঙালপনা নিরস্ত করেছিল ও এমনি একটা কথা বলে। রাখী সেদিনের কথা অবশ্য ইতুকে বলেনি, কিন্তু এখন হয়তো দীপক ভাবছে, ইতু সব জানে। হয়তো লজ্জা পাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। কিংবা ভিতরে ভিতরে রাখীর ওপর রেগে যাচ্ছে। তা না হলে দীপক গুম মেরে চুপ করে গেল কেন!

ওদিক থেকে টমটমের মা টমটমকে ডাক দিলেন। স্ল্যাক্‌স্‌ আর ঢিলে কুর্তা পরা মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো।

রাখী টমটমকে দিয়ে আসতে যাচ্ছিল। অতীশ বললে, যাবেন না, যাবেন না। ঢিলে কুর্তা আসুক না এদিকে।

ইতু হেসে উঠলো। তার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললে, দারুণ! লেগে পড়ুন, লেগে পড়ুন।

রাখী দীপককে বললে, এই, তুমি ওর দিকে তাকাবে না কিন্তু।

ঢিলে কুর্তা আধখানা দূরত্ব এগিয়ে এসেছে দেখে অতীশ ঝট করে টমটমকে তুলে নিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

ওরা এখান থেকে দেখতে পেল ঢিলে কুর্তার কোলে টমটমকে দিতে দিতে অতীশ দিব্যি কথা বাড়াচ্ছে, হাসছে।

একটু পরেই অতীশ ফিরে এল, ঘাসের ওপর ট্রাউজার্সের সরু পা দুটো লম্বা করে দিয়ে বসে পড়লো।

—কি, ঠিকানাটা জেনে নিলেন? ইতু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলো।

অতীশ হেসে বলল, আপনার কাছেই পাচ্ছি না, ও তো একটা রিয়েল বিচ্ছু। কি চোখ মাইরি দীপক, একেবারে সাপের ছোবল।

বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। তারপর ঠাট্টা করে ইতুকে বললে, খাবেন নাকি একটা!

ইতু হাত বাড়ালো, ভাবছেন পারি না?

প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে নিল, একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে ধরলো ইতু; রাখী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, এই না, এই না। বলে সিগারেটটা টেনে নিল। রাখী ঐ ফ্যামিলি গ্রুপটার দিকে ইশারা করে দেখালো। অর্থাৎ ওরা দেখতে পাবে।

ইতু হেসে উঠলো।—খারাপ মেয়ে ভাববে, এই তো! আমি কি ভাল নাকি?

আবার শব্দ করে তুড়ি দিয়ে উঠলো। বললে, আরে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দে সব। কে কি ভাবলো সব সময় সে-কথা ভাবলে নিজের ভাবনা ভাববো কখন!

অতীশ ততক্ষণে রাখীর হাত থেকে (আঙুলে আঙুল ছুঁলো) সিগারেটটা নিয়ে ঠোঁটে চেপে দেশলাই জ্বাললো। পর পর কয়েকটা রিং ছেড়ে বললে, এটুকুই সান্ত্বনা, সিগারেটে আপনার ছোঁয়া রয়েছে।

ছোঁয়াটা ইতুর ঠোঁটের, তাই কথাটা নন্দিতার কানে খুব খারাপ ঠেকলো, ও লজ্জা পেল। চোখ তুলে সোমনাথের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। তবু লজ্জা কাটাবার জন্যে বললে, আপনি সিগারেট খান না?

ছেলেরা সিগারেট না খেলে নন্দিতার ভাল লাগে না। একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে একা একা সিগারেট টানছিল। অন্ধকারে তার শরীরটা শুধু আবছা দেখা যাচ্ছিল। একা একা তাকে দেখে নন্দিতার মনে হয়েছিল ছেলেটা নিজেও জ্বলছে। নন্দিতার মনে হয় সব ছেলে-গুলোই ভিতরে ভিতরে জ্বলছে।

সোমনাথ যেন নন্দিতার কথা রাখার জন্যেই তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে।

ময়লা ইজের-পরা খালি-গা বাচ্চাটা আবার এসে দীপককে জিজ্ঞেস করলে, এবার চা আনবো বাবু?

দীপকের চালচলনের মধ্যে কি একটা আছে, কিংবা ওর চেহারায়, তা না হলে ঐ বাচ্চা ছেলেটা ওর কাছেই অর্ডার নিতে আসবে কেন। আরেকটা ছেলে, ঐ একই রকম কালোকুলো চেহারা, সে ভিক্ষে চাইছিল, কিন্তু দীপকের কাছে গেল না। একবার নন্দিতার কাছে হাত পাতলো, একবার অতীশের কাছে। দীপক তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল, তারপর অন্য বাচ্চাটাকে বললে, যা, নিয়ে আয় চা। ভাঁড় আছে তো?

বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে সরু মেটে রাস্তাটা যেখান থেকে নেমে এসেছে ঠিক সেই মোড়ে খানকয়েক দোকান উঠেছে পর পর। ছিটে বেড়ার দেয়াল, হোগলার ছাউনী। একটায় পান সিগারেট—সস্তার সিগারেট কয়েক ধরনের, তাও সামান্য কয়েক প্যাকেট, বেশির ভাগই খালি-প্যাকেট সার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। আর দোকানের সামনে উনোনে চাপানো তেলেভাজার কড়াই। আরেকটা দোকানে বাসী পাঁউরুটি, নোনতা বিস্কুট, আর চা। সামনে একটা তেলচিটে টেবিলের ওপর কাচের গেলাস, চায়ের কাপ সাজানো আছে, আর তোলা-উনোনে কুচকুচে কালো একটা বড় সাইজের কেটলি। টেবিলের ওপর ছাঁকনি, জাল ছিঁড়ে গেছে বলে একটা ন্যাকড়া দিয়ে চা ছাঁকা হয়। ন্যাকড়াটা চায়ের দাগে দাগে লাল হয়ে গেছে।

দোকান ক'টার আসল খদ্দের কিন্তু পিকনিক পার্টির লোকেরা নয়। বড় রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি চলে, ধানের বস্তা, খড়, কিংবা অন্য কিছু। তারাই আসল খদ্দের। কখনো কখনো ট্রাক ড্রাইভার কেউ, কিংবা দূর পাল্লার মোটর গাড়ির যাত্রীরাও দু'দণ্ড থেমে চা বিস্কুট খায়।

এক হাতে ছোট একটা কেটলি আর অন্য হাতে সার দিয়ে সাজানো মাটির ভাঁড় নিয়ে বাচ্চাটা ফিরে এল। সকলের হাতে হাতে ভাঁড় দিয়ে চা ঢেলে দিল।

নন্দিতার মনে পড়লো, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চা খাবার সময় সোমনাথ চায়ের ভাঁড়টা ওকে এনে দিয়েছিল। নন্দিতা সেটা নেবার সময় চোখ তুলে তাকাতেই দেখেছিল, সোমনাথ ওর চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে আছে। নন্দিতার তাই ইচ্ছে হলো এবার চায়ের ভাঁড়টা সোমনাথের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু পারলো না, বাচ্চা ছেলেটাই হাতে হাতে ভাঁড় ধরিয়ে দিয়েছে।

অতীশ পরম তৃপ্তিতে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, ফাইন। বলে বাঁ হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকালো পয়সা দেবার জন্যে।

নন্দিতা চায়ের ভাঁড়টা সযত্নে ঘাসের ওপর বসিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে মৃদু হেসে দীপকের দিকে তাকালো।—চায়ের পয়সাটা আমি যদি দিই?

দীপক ধমকের চোখে তাকালো নন্দিতার দিকে, তারপর ছেলেটার হাতে এক টাকার একখানা নোট দিয়ে বললে, বাকিটা তোর।

ছেলেটা একমুখ হেসে ফেলে চলে গেল কেটলি দোলাতে দোলাতে।

ইতু পয়সা দেবার কোনো চেষ্টা করেনি। ও চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে, যে দেবেন দিন, আমার আপত্তি নেই। বলে হাসলো।

অতীশ বললে, এক নম্বরের কিপ্‌টে।

ইতু হেসে বললে, হ্যাঁ, সেইটুকু মনে রাখবেন, আমি সব ব্যাপারেই কৃপণ।

একটু থেমে বললে, ছেলেরা আমার জন্যে খরচ করলে আমার খুব ভাল লাগে, জানেন। নিজেকে খুব দামী দামী মনে হয়।

সোমনাথও এ-কথায় হেসে উঠলো। নন্দিতা হাসলো না। ওর ব্যাগে বেশি পয়সা নেই। থাকেও না। আর সেজন্যেই বোধহয় ওর সব সময়ে সংকোচ। কিছু একটা খরচ করে ও হালকা হতে চাইছিল, সকলের সমান হতে চাইছিল। ওর তাই একবার মনে হলো, দীপক কি ওর অবস্থার কথা ভেবেই পয়সা দিতে দিল না! কিন্তু পয়সা দিতে পেল না বলে ওর যেমন একটু অস্বস্তি লাগলো, তেমনি পয়সাটা খরচ হলো না বলেও বোধহয় খুশী হলো।

দীপক ভাঁড়টা দূরে ছুঁড়ে দিল চা শেষ হতেই, তারপর বললে, ছেলেটা কিন্তু দামের জন্যে আমার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

অতীশ হাসলো।—তোর একটা পার্সোনালিটি আছে তো, দেখলি না, ভিক্ষে চাইছিল যে ছেলেটা, তোর কাছে গেল না।

রাখী ঠোঁট টিপে হাসলো, তারপর গর্ব যেন তার নিজেরই এমন ভাবে বলল, আছেই তো।

রাখী ঠিক বুঝতে পারেনি, অতীশ একটু আগে সিগারেটটা ওর হাত থেকে নিতে গিয়ে ইচ্ছে করেই ওর আঙুল ছুঁয়েছিল কিনা। প্রথম যেদিন দীপক ওর সঙ্গে অতীশের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, সেদিন অতীশের চোখ এক পলকেব জন্যে শরীর হয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ সেজন্যই। হাসি পেয়েছিল, গর্বও হয়েছিল রাখীর। তার জবাবেই যেন বললে, আছেই তো। ও যে দীপকের জন্যে গর্বিত সে-কথাটাই বলতে চাইলো।

দীপকের জন্যে সত্যিই ভিতরে ভিতরে গর্ব হয় রাখীর। এই মানুষটার ওপর ও সব সময় চোখ বুজে নির্ভর করতে পারে।

দীপকের সঙ্গে রাখীর দেখা হওয়ারই কথা নয়, আলাপ কিংবা ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা। ওর তখন কলেজের নিরঞ্জনকেই বরং একটু ভাল লাগছে। আর রাখী বেশ বুঝতে পারতো ওর সম্বন্ধে নিরঞ্জনের রীতিমত দুর্বলতা আছে। নিরঞ্জনকে ইতুরও ভাল লাগতো। একদিন ঠাট্টা করে বলেও ছিল।—দ্যাখ রাখী, নিরঞ্জনের সঙ্গে আড্ডা দিতে যা ভাল লাগে তোর, বলা যায় না, হঠাৎ কোনদিন প্রেমফ্রেম হয়ে যেতে পারে। রাখী হেসে ফেলে বলেছিল, কিন্তু নিরঞ্জন তো তোকেই পছন্দ করে। অবশ্য নিরঞ্জনের ব্যবহারে বোঝা যেত না সত্যি কার ওপর তার দুর্বলতা। অমন প্রাণবন্ত ছেলেদের ঘূর্ণিঝড়ের মত চলাফেরা দেখে বোঝা যায় না কোনদিকে হঠাৎ বাঁক নেবে। তাই ইতুরও কখনো কখনো তেমন সন্দেহ হয়েছে। শেষে ইতু একদিন হাসতে হাসতে মীমাংসা করে দিয়েছে, তেমন কিছু ঘটলে আমরা নয় দু'জনেই ভালবাসবো, দু'জনেই। রাখী হেসেছে।—তাই ভাল। আমরা নতুন কিছু করবো।

কিন্তু নিরঞ্জনের বোধহয় অত থিতিয়ে ভাবার মত সময় ছিল না। ও সব সময় ছোটাছুটি করছে, কখনো পত্রিকা নিয়ে মাতামাতি, কখনো মিটিং, কখনো নাটক কিংবা ফাংশন। জলপাইগুড়িতে বন্যা হলো, সে যেন নিরঞ্জনের মনেও। একটা চ্যারিটি ফাংশন করতে হবে বলে নেচে উঠলো ও, টিকিট ছাপালো।

তারপর রাখী আর ইতুকে বললে, টিকিট বিক্রি করে দিতে হবে। ইতু ওসবের মধ্যে নেই। হাত ঝেড়ে বললে, না বাবা, আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে যদি বলিস, তোকে বিয়ে করতে হবে সে তবু সোজা।

রাখী পরে বলেছিল, তুই ওকথা কি করে বললি? আমার এত বিচ্ছিরি লেগেছিল!

ইতু শব্দ করে তুড়ি দিয়ে বলেছিল, আরে, বাড়িতে বলে দিয়েছি বিয়ে-বিয়ে না করতে! তুই তো জানিস্, প্রেমফ্রেম আমি বিশ্বাস করি না, ইচ্ছে হয় একজন কাউকে ধরবো, সিঁথিটা এগিয়ে দিয়ে বলবো, দে না ভাই সিঁদুর টেনে।

রাখী শুধু হেসেছে তার কথায়। কিন্তু নিরঞ্জনকে 'না' বলতে পারেনি। টিকিটের বইটা নিয়ে বলেছে, চেষ্টা করবো। আর নিরঞ্জন জোর দিয়ে বলেছে, চেষ্টাফেষ্টা জানি না, এই দশটা টিকিট অন্তত বেচে দিতে হবে!

কি আর করবে রাখী, এর-ওর কাছে গোটা তিনেক গছিয়ে একদিন চলে গেছে তাদের পুরোনো পাড়ার রেবাদির কাছে। আগে ওরা যে বাড়িতে থাকতো তার পাশের ফ্ল্যাটে। রেবাদি চাকরি করেন, ওঁর অনেক আলাপ-পরিচয় আছে।

রেবাদি ব্যাপারটাকে তুচ্ছ মনে করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেই রাখীর মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়েছিল। টিকিট বেচতে পারিনি এ-কথা নিরঞ্জনকে বলা যায় নাকি। ইতু পারে। তাছাড়া এর সঙ্গে ওর নিজেরও প্রেস্টিজ জড়িয়ে আছে। দশটা মাত্র টিকিট বেচতে না পারার মানে তো এই যে, ওর সে-রকম সার্কেলই নেই। চেনা-জানা নেই।

রেবাদি শেষ অবধি বলেছেন, ঠিক আছে, দেখি চল দু'এক জায়গায়।

এই বলে দীপকের কাছে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। দীপকের আপিসে। রাখীর তখন ভয়-ভয় করছে। যেন টিকিট বিক্রি করার ওপরই ওর সব সম্মান নির্ভর করছে। কলেজের অন্য সকলে কত কত টিকিট বেচতে পেরেছে, আর ও কিনা এই দশটা মাত্র টিকিট...

আপিসে রিসেপ্সনিস্টকে স্লিপ দিয়ে মিনিট কয়েক বসে থাকতেও হয়েছে রেবাদিকে। তারপর ডাক এসেছে।

রাখী এর আগে কখনো কোনো আপিসে যায়নি। রেবাদির পিছনে পিছনে ছোট কামরাটায় ঢুকতে গিয়ে ওর মত স্মার্ট মেয়েও জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল।

রেবাদি কিন্তু গিয়েই বললেন, দীপক, দশটা টাকা দাও তো।

দীপক হেসে বসতে বললো, রাখীর দিকেও ফিরে বললে, বাঃ, আপনি বসুন! তারপর জিজ্ঞেস করলে, ধার না দান?

রেবাদি বললেন, আগে দাও না তুমি।

রাখী কি বোকা, টিকিটের বইটা বের করে ফেলেছে দীপক দশ টাকার নোট-খানা রেবাদির হাতে দিতেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপক নোটখানা ছিনিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, ও নো নো, চ্যারিটি-ফ্যারিটির মধ্যে আমি নেই।

রাখীর মুখ শুকিয়ে গেছে হঠাৎ আশা পেয়েও এভাবে নিরাশ হয়ে। তার চেয়ে বড় কথা, ওর কেমন অপমান অপমান লেগেছিল। হাজার হোক, ও তো মেয়ে, দীপক ওকে সমীহ না করুক, সম্মান রাখার জন্যেও তো কত ছেলে মেয়েদের কথা রাখে।

রাখী তাই মুখ কালো করে চোখ নামিয়েছে। ও কি ভিখিরি নাকি, না ঠকিয়ে দশটা টাকা নিতে এসেছে!

দীপক কিন্তু ওর মুখের ভাব বদলে যাওয়া দেখেই বলে উঠেছে, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন, এটা তো আমার আর রেবাদির ঝগড়া।

রাখী আবার আশা পেয়ে হেসে ফেলেছে।—না নিলে আমি কিন্তু কলেজে মুখ দেখাতে পারবো না। কার কাছে বেচবো বলুন, আমি তো কাউকেই চিনি না।

দীপক তখন প্রশ্ন করে করে সব ব্যাপারটাই জেনে নিয়েছে, আর রাখীর কথায় অসহায় ভাব ফুটে উঠতে দেখে বলেছে, কই, দেখি টিকিট বইটা।

বলে টিকিট বইটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।—এক মিনিট, আমি আসছি।

মিনিট দশ পনেরো মাত্র, তারপরই দীপক ফিরে এসেছে। তখন আর মাত্র দু'খানা বাকি। হিসেব মত টাকা রাখীর হাতে গুণে দিয়ে বলেছে, এ দুটো আর পারলাম না।

রাখী হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। দীপকের ওপর ও দারুণ খুশী না হয়ে পারলো না।

রেবাদি কিন্তু ফোড়ন কাটতে ছাড়লেন না। বললেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, বুড়ি রেবাদির কথায় দশ টাকাও আসছিল না।

সেদিন দীপক রাখীদের কোকাকোলা খাইয়ে তবে ছেড়েছিল।

ইতু সে-সব কথা সবই জানে। রাখীর কাছে শুনেছে। ও তাই অতীশের কথার পিঠে বলে উঠলো, পার্সোনালিটি নেই আবার, দশ মিনিটে পাঁচ-পাঁচখানা টিকিট গছাতে পারেন আপিসের বন্ধুদের।

অতীশও সে-ঘটনার কথা জানে। জানে বলেই শব্দ করে হেসে উঠেছে, তারপর কপট গাম্ভীর্যে বলেছে, আসল ব্যাপার জানেন না বুঝি? বিক্রিফিক্রি বাজে কথা, আপনার বন্ধুটিকে দেখে ভাল লেগে গিয়েছিল, ইম্প্রেস করার জন্যে নিজেই কিনেছিল বন্ধুদের নাম করে।

এ ধরনের কথা অতীশ মাঝে মাঝেই বলে, রাখী মনে মনে হাসে।—আমার ওপর অতীশের বোধহয় খুব লোভ, ইতুকে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল।

দীপক অতীশের এসব ইয়ার্কি পছন্দ করে না। 'হাট্' বলে ও সাবধান করেছে, ওদের কোনো সেন্স অফ হিউমার নেই, সত্যি বিশ্বাস করে বসবে। 'ওদের' অর্থাৎ রাখীর।

রাখী হেসে গড়িয়ে পড়েছে।—বাঃ রে, তা হলে তো আরো খুশী হব। বুঝবো এই মুখটার দাম আছে।

যেন সে-কথা জানে না ও। খুব ভাল করেই জানে। এখন তো তাই নিরঞ্জনের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আগে একদিন তার সঙ্গে আড্ডা দিতে না পারলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো, এখন নিরঞ্জন হাত ধরে টানাটানি করলেও একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ঠিক সোয়া পাঁচটায় মেট্রোর সামনে। দীপক আপিস ফেরত সোজা সেখানে চলে আসে।

আসলে জীবন্ত, উদ্দাম, উচ্ছল, ওসব কিছু নয়। একজন শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আরেক জনের মুখ ফিরিয়ে তাকানোর ফুরসত নেই—এর মধ্যে কাকে ভাল লাগবে সে-কথা বলতে হবে নাকি। রাখী তখন কিছু একটা খুঁজছিল, কি খুঁজছিল জানতো না। বোধহয় নিজেকে। দীপকের মধ্যে দেখতে পেল।

আজকের এই পিকনিক, কিংবা ইতু-নন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা যাওয়া, সবই আসলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। ওরা দেখুক, দীপক ওকে কতখানি ভালবাসে। ও যা চায় তা যেন দীপকেরও চাওয়া। রাখী বলতে না বলতে পিকনিকে আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাখীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'আমরা দু'জনেই ভালোবাসবো', ইতু দেখুক না চেষ্টা করে, দীপককে টলাতে পারে কিনা। তবে ইতুকে বিশ্বাস নেই, ও তো প্রেম আছে স্বীকারই করে না, তাই দীপকের সঙ্গে ইতুকে একা একা? না বাবা। একদিন নিউ মার্কেটে নাকি ইতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, [illegible] দীপকের ওপর খুব রেগে গিয়েছিল মনে মনে।

—আচ্ছা, ওগুলো টগর, তাই না নন্দিতা হঠাৎ বলে উঠলো।

রাখী ফিরে তাকিয়ে দেখলো ফ্যামিলি গ্রুপটার ওধারে একটা টগর গাছ। ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছটা। আর স্ল্যাক্‌স্‌ এবং লাল ঢিলে কুর্তার মেয়েটা লাফ দিয়ে দিয়ে একটা ডাল নামাবার চেষ্টা করছে ফুল তুলবে বলে।

ইতু ভুরু নাচিয়ে অতীশকে বললে, যান না স্যার, একটু সিভাল্‌রি দেখান।

নন্দিতা তার আগেই বলে উঠেছে, চলুন, চলুন। টগর আমার ভীষণ ভাল লাগে। বলে নন্দিতা উঠে পড়ে সকলের দিকে তাকালো। কেউ উঠলো না দেখে তার মুখটা অস্বস্তিতে ম্লান হলো। আর অস্বস্তি ঢাকার জন্যেই একা একাই সেদিকে পা বাড়ালো।

অতীশ চোখ টিপে সোমনাথকে বললে, যা না।

রাখীও বললে, এই, সত্যি যান, বেচারা কেমন মন-মরা হয়ে আছে, কেউ ওর দিকে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন না।

সোমনাথের ইচ্ছে হচ্ছিল ; সাহস পেয়ে ও সত্যি সত্যি এগিয়ে গেল।

আর ওরা দেখলে সোমনাথ পৌঁছে যাওয়ার আগেই সেই মিষ্টি বৌটাও টগর গাছটার কাছে পৌঁছে গেছে।

ইতু দেখে বললে, ভারী সুইট রে বৌটা। ঐ ফিয়েটটা ওদের, না?

কেউ উত্তর দিল না। রাখী একবার নতুন ঝকঝকে ফিয়েটটার দিকে তাকালো, একবার দীপকের গাড়িটার দিকে। দীপক নিজের গাড়িটার দিকে তাকালো না, শুধু ফিয়েট গাড়িটার নম্বর পড়বার চেষ্টা করলো। অর্থাৎ কত নতুন।

ফিকে হলুদ স্ল্যাক্‌স্‌ আর ঢিলে কুর্তার লালে অরেঞ্জে কিশোরী মেয়েটিকেও ফুলের মত লাগছিল। লাফ দিয়ে দিয়ে একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করছিল ও।

নন্দিতা ধীরে ধীরে গাছটার কাছে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু নাগাল পাবে কি পাবে না এই সন্দেহে মিষ্টি বৌটার দিকে তাকিয়ে হাসলো। মিষ্টি বৌটা তখন হাসতে হাসতে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে লম্বা হবার চেষ্টা করছে।

নন্দিতা তার দিকে তাকিয়ে বললে, টগর, তাই না?

মিষ্টি বৌ ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছে, বললে, হ্যাঁ।

আর কিশোরী মেয়েটি বলে উঠলো, সত্যি? এটাই টগর ফুল?

সোমনাথ ইতিমধ্যে এসে পৌঁছে গেছে। ও একটা লাফ দিল, ডাল নামিয়ে আনলো একটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই ফুল ছিঁড়ে নিল যে যতগুলো পারলো। তিনজনই যেন খুশীতে টইটম্বুর।

নন্দিতা মিষ্টি বৌটিকে প্রশ্ন করলে, আপনারা কি কোলকাতা থেকে?

—না। মিষ্টি বৌটি মৃদু হেসে বললে, উনি তো কনস্ট্রাকশনের ইঞ্জিনিয়ার, হলদিয়ায় কাজ হচ্ছে, তাই ভাবলাম...আপনারা?

নন্দিতা বললে, কোলকাতা থেকে, পিকনিক করতে। আমরা সব কিন্তু বন্ধু। বলে হেসে ফেললো।

তারপর হেসে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। ভদ্রলোক, মনে হলো, একদৃষ্টে তাঁর বৌটিকেই দেখছেন। একটু বয়সের তফাত, হয়তো আট-দশ বছর। কপালের দু'ধারে বয়সের টাক চুলের মধ্যে অনেকখানি অবধি এগিয়ে গেছে। কিন্তু বেশ সুশ্রী।

বোধ হয় সোমনাথের উপস্থিতির জন্যেই বৌটি মিষ্টি হেসে ঘাড় কাত করে বোঝালো, চলি। তারপর দু' হাতে ফুলগুলো নিয়ে স্বামীটির কাছে ছুটে পালালো।

সোমনাথ তখন আরেকটা ডাল ধরে একটা ফুল তুলে নিয়েছে।

ঢিলে লাল কুর্তার মেয়েটি সোমনাথকে বললে, আরেকটা ডাল টেনে ধরুন না, আমি একদম পাইনি, দেখুন ক'টা মাত্র।

নন্দিতা হেসে ওর হাতের সব ফুলগুলো মেয়েটিকে দিয়ে দিল।

আর সোমনাথ যে ফুলটা নিজে তুলেছিল সেটাই নন্দিতার দিকে এগিয়ে দিল। নন্দিতা ফুলটা হাতে নিয়ে ইতু-রাখীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসলো, তারপর দু'হাত পিছনে নিয়ে চুলে গুঁজলো।

সোমনাথ ততক্ষণে লাফ দিয়ে একটা পুরো ডালই ভেঙে নিয়েছে। সেটা নন্দিতার হাতে দিয়ে দীপকদের কাছে ফিরে এল।

অতীশ বললে, লাল টগরটা আনতে পারলি না?

সোমনাথ বুঝতে পারলো না, কিন্তু ইতু হেসে লুটোপুটি। বললে, সত্যি, বেশ টগর-টগর চেহারা।

দীপক বললে, ফুলটুল যেন কত চেনেন। এই তো প্রথম দেখলেন, তার আবার টগর-টগর চেহারা।

ইতু হাসলো। রাখীও। রাখীই বললে, বাঃ রে, নাই বা চিনলাম, কিন্তু টগর-টগর চেহারা বললে ঠিক ঐ রকম চেহারাই মনে হয়।

তারপর হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে, নন্দিতা কোথায় গেল?

নন্দিতা ইচ্ছে করেই সোমনাথের দেওয়া ফুলটা চুলে গুঁজেছিল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওর নিজেরও খুব স্মার্ট হয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাই। কিন্তু ফিরে গেলেই ওরা কিছু টীকাটিপ্পনি করবে তো, সে-জন্যেই মিষ্টি বৌটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেদিকেই এগিয়ে গেল।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তখন টিফিন কেরিয়ার খুলে বসেছেন। পাশে জলের ফ্লাস্ক।

মিষ্টি বৌটি উঠে দাঁড়ালো। ওকে ডাকলো। তারপর প্রশ্ন করলে, আপনারা সব কলেজে পড়েন বুঝি?

—না না। আমরা সব বন্ধু। আমরা তিনজন অবশ্য...

মিষ্টি বৌ হেসে বললে, আমাদের কিন্তু অনেকদিন বিয়ে হয়েছে, তিন মাস। একটু থেমে বললে, আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার আছে, আসুন না।

নন্দিতা হেসে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো। তারপর ধীরে ধীরে দীপকদের দিকেই চলে গেল। কারও খাবার সময় দাঁড়িয়ে গল্প করতে নন্দিতার রুচিতে বাধে।

মিষ্টি বৌ ঠাট্টার সুরে স্বামীকে বললে, বিয়ে করে খুব ঠকে গেছ ভাবছো তো। যাও না, ওদের সঙ্গে গল্পটল্প করে এসো। তোমার তো আবার ঐরকমই পছন্দ।

ইঞ্জিনিয়ার হাসলো।—খারাপটা কি শুনি।

—না, না, ভীষণ ভালো মেয়ে সব, বন্ধুদের সঙ্গে এতদূরে হৈ হৈ করতে এসেছে, বি এ. পাশ বৌ জুটতো একটা কপালে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো।

আসলে স্বামী যে বিয়ের আগে প্রতিজ্ঞা করেছিল বি. এ. পাশ না হলে সে মেয়েকে বিয়ে করবে না, এ খবর ফুলশয্যার দিনেই বড় ননদ ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল। কলেজের মুখ ও মাত্র মাস কয়েক দেখেছিল. তাই কথাটা শুনে খারাপও লেগেছিল। মনের মধ্যে ওর একটা কাঁটা বিঁধেই ছিল, ও তেমন শিক্ষিতা নয় বলে স্বামী নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে অখুশী। সুযোগ বুঝে তাই কথাটা শুনিয়ে দিল।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওদের হাসি-হল্লা সপ্রতিভ ভাব ওর বেশ ভালই লাগছিল। লাল-পাড় শাড়ির ঠান্ডা মেয়েটি দিব্যি বলে দিল. আমরা সব বন্ধু। কোনো লুকোনোর চেষ্টা নেই। কোনো সঙ্কোচ নেই। ওদের বাড়ির আবহাওয়াই হয়তো অন্যরকম। বাবা-মা নিশ্চয় দিনরাত আগলে আগলে রাখে না। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে নিশ্চয় ভিরমি খায় না।

ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ বললে, যাই বলো, কত ফ্রি দ্যাখো ওরা। তোমার তো আমার সঙ্গে আসতেও লজ্জা, মা কি ভাববে!

মা অর্থাৎ শাশুড়ী। যেন বিয়ের পর ঐ মেয়েগুলোও লজ্জা পাবে না বরের সঙ্গে বেড়াতে যেতে। কি জানি, ওদের শ্বশুর শাশুড়ীও হয়তো অন্যরকম। ওর ইস্কুলের বন্ধুরা তো ওদের কথা শুনলেও বিশ্বাস করবে না। ওরা এসব ভাবতেই পারতো না। শুধু নিজেদের মধ্যে কাউকে, কোনো ছেলেকে নিয়ে হয়তো কানাঘুষো করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে। একটা ইস্কুলের মেয়েকে ওদের গলির মোড়ে একজনের হাত থেকে মাঝে মাঝে টুক করে চিঠি নিতে দেখতো, তাতেই মনে হতো, মেয়েটা কি খারাপ, কি খারাপ! ওর নিজেরও রাস্তা ফাঁকা থাকলেই ভয় হতো, যদি কেউ ওর হাতে চিঠি গুঁজে দেয়। ভয় পেত ঠিকই, কিন্তু চিঠি পেতেও বোধহয় ইচ্ছে হতো।

তবু, ওদের যেন কতই অপছন্দ এমন ভাবে বললে, আচ্ছা ওদের কি বাবা-মাও নেই! বলে হাসলো।

একটা কালোকুলো আধা ভিখিরি ছেলে তখন ময়লা ইজের টানতে টানতে

এসে ভিক্ষে চাইছে।

একটা যায় তো আরেকটা আসে। এদের জন্যে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। একটু আগে একজনকে দিয়েছে, এই আবার।

এমন সুন্দর জায়গাটা, হাতের কাছে এক রাশ টগর ফুল, আর ফুর্তি-পাগল একদল ছেলেমেয়ে। কত চমৎকার লাগছিল, তার মধ্যে একটা নোংরা ছেলে—খাইনি বাবু, কিছু দিন না বাবু! তাও ঠিক টিফিন কেরিয়ার খুলেছে সেই সময়।

রোদ পড়ে আসছিল। রোদ যতই পড়ে আসছিল দীপক ততই যেন অধৈর্য হয়ে উঠছিল। রাখী কি স্রেফ ওকে একটা ড্রাইভারই ভেবেছে নাকি! আর রাখী যখন যা হুকুম করবে ও তাই তামিল করে যাবে? 'আজ আমরা সব্বাই মিলে সিনেমা যাবো', 'এই, আজ ইতুকে আনলাম বলে রাগো নি তো', 'ইতু বলছিল ওয়ালডর্ফে খাওয়াতে হবে একদিন।' দীপক একদিন সত্যি সত্যি চটে গিয়েছিল। ভেবেছিল রাখী ওকে এড়িয়ে চলছে। নাগালের মধ্যে আসতে চায় না। 'কেমন নাচিয়ে বেড়াচ্ছি দ্যাখ', ইতুকে বলে কিনা কে জানে। অথচ প্রথম প্রথম যখন ওরা দু'জনে সার্কুলার রোডের সিমেট্রির মধ্যে গিয়ে কোনো একটা কবরের পাশে বসতো তখন তো কোনো কোনোদিন রাখীর গলাও কথা বলতে বলতে গাঢ় হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে ঐ যে সাহিত্য-টাহিত্যে গাঢ় গলার কথা পড়েছে, তার আগে সেটা যে ঠিক কেমন ওর ধারণাই ছিল না। ভিকটোরিয়া, আউটরাম, গড়ের মাঠ—কত কত জায়গা রয়েছে, দুপুর বিকেল সন্ধ্যে তো জোড়ায় জোড়ায় কত ছেলেমেয়ে বসে থাকে। কারো ভয় নেই, যত ভয় রাখীর। 'না, না, কলেজের মেয়েরা দেখতে পাবে।' দীপককে যেন আড়াল করে রাখতে চায়। কলেজের কোনো বন্ধুটন্ধুর সঙ্গে প্রেম আছে কিনা এক-একবার সন্দেহ হয়েছে দীপকের। আসলে তাকেই হয়তো ভয় রাখীর। মেয়েদের এত ভয় করার কি আছে, দীপক বুঝতে পারতো না। তাই এই কবরখানার নির্জনতা বেছে নিতে হয়েছিল। কবরের ফলকে লেখা পড়ে, বুড়ি মেমের কান্না দেখে, কিংবা পিতলের ভাসের গায়ে নক্‌শা দেখে সময় কেটে যেত।

কিন্তু শরীরটাকে একটুখানি কাছে না পেলে যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সন্দেহ ঘোচে না। একদিন সিনেমায় কাঁধে হাত রাখতে গেছে, অমনি 'সভ্য হয়ে বসো তো', বলে হাতটা সরিয়ে দিয়েছে, আড়চোখে দীপকের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসেছে। আরেকদিন, তখন ইতু নন্দিতা জেনে গেছে, রাখী নিজেই জানিয়েছে, গড়ের মাঠে গিয়ে বসেছে ফুচকা-টুচকা খেয়ে, শুধু ওরা দু'জন, দীপক ওর ঘাড়ে আঙুল ছুঁইয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রাখী হেসে উঠেছে। 'এই, আমার কাতুকুতু লাগে।' আর-একদিন একটু স্পষ্ট হতে গেছে, যেদিন এখানেই এব আগে এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে 'জানি, জানি, শেষ অবধি সেই এক। অন্য সকলের সঙ্গে তোমার তফাতটা কি তা হলে!' দীপক রেগে গিয়ে বলেছে, 'মানে অন্যদের বেলায় আপত্তি নেই, আমি ভালবাসি বলেই'—কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল বলেই রাখীও রেগে গিয়েছিল। সারা বিকেল, ফেরার পথ—দু'জনেই গুম্।

তবু আজ পিকনিকে আসতে রাজী হয়েছিল রাখীর কথায়, কারণ ও ভেবেছিল, আগের দিনের বিস্বাদ কাটিয়ে দেবার জন্যেই রাখী আসতে চেয়েছে। ভেবেছিল কোনো সুযোগে ওরা একটু আলাদা হতে পাবে।

কিন্তু রাখীর দিক থেকে কোনো আগ্রহই নেই যেন। একটুক্ষণের জন্যে দু'জনে একান্তে বসে একটু কথাও তো বলতে পারতো। অথচ কি ভাবে ওদের কাছ থেকে আড়াল হবে দীপক খুঁজে পাচ্ছিল না। আর রাখীকেও ও ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের সম্পর্ক সকলেই যখন জানে তখন ওর কাছ ঘেঁষে বসতে তো পারে। অথচ এ দিকে বেলা পড়ে আসছে।

দীপক একবার ভাবলো, বলি, ব্রীজের ওপর থেকে ঘুরে আসি চলো। কিন্তু

তখন হয়তো অতীশ ইতুও যেতে চাইবে।

ভিতরে ভিতরে ও যত অধৈর্য হয়ে উঠছিল ততই মনে হচ্ছিল, এখানে আসার কোনো মানে হয় না।

ঠিক সেই সময়েই ইতু বলে উঠলো, ও মশাই, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, কি আছে বের করুন।

অতীশ বললে, কিচ্ছু নেই, ঐ দোকানে চলে যান, ব্রিনজেল চপ আছে। খেয়ে আসুন। মানে বিশুদ্ধ তেলেভাজা।

ইতু হাসলো।—ও বাবা, আপনি যাকে বিয়ে করবেন সে-বেচারী বোধহয় শুধু ডালমুট চিবোবে।

—আর প্রেম করলে? রাখী টিপ্পনি কাটলো।

ইতু বললে, ম্যাক্সিমাম চানাচুর। আবার কি!

অতীশ হেসে বললে, ঠিক বলেছেন। তবে আপনি হলে সঙ্গে চীনেবাদামও খাওয়াবো।

ক্ষিদে বোধহয় সকলেরই পেয়েছিল। সোমনাথ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। ওর ভেঙে আনা টগরের ডালটা দীপক মাঝখানে মাটিতে গর্ত করে বসিয়ে দিয়েছিল, আর ফুলগুলো তুলে নিয়ে রাখী আর ইতু চুলে গুঁজেছিল। কিন্তু ও বোধহয় তা চায়নি। ও ভেবেছিল সব ফুলগুলোই নন্দিতা নেবে। তবু ওর দেয়া একটা ফুল নন্দিতা যে চুলে গুঁজেছিল তার জন্যেই ও খুশী হয়ে গিয়েছিল। সাদা টগরে আর লাল-পাড় শাড়িতে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল বলে ওর আর অত সুন্দর-ফুন্দরের দিকে মন ছিল না।

ও তাই বলে উঠলো, ক্ষিদে ভাই আমারও পেয়েছে।

দীপকের ক্ষিদেটিদে ছিল না, তবু ও ভাবলো, ও-পাট চুকিয়ে ফেলাই ভাল।

অতীশ ততক্ষণে কেরিয়ারের কাছে গিয়ে মাংসের ডেকচিতে হাত দিয়েছে। হাত দিয়েই বললে, আইস-কোল্ড।

তারপর ইতুর দিকে তাকিয়ে বোধহয় কিছু একটা ইশারা করলো। বললে, এক কাজ করি। এটা ঐ তেলেভাজার উনোনে গরম করে আনি।

ইতু বললে, দি আইডিয়া। কিন্তু বসেই রইলো। অতীশের ইশারার অর্থ হয়তো ও বুঝতে পারেনি।

অতীশ বাঁ হাতের দু'আঙুলে ধরা সিগারেট নাচিয়ে ইতুকে ডাকলে, চলুন দিদিমণি, আমি বাবুর্চির মত এনে দেবো, আপনি বসে বসে খাবেন সে চলবে না।

ইতু হেসে উঠলো।—আহা রে, বাড়িতে নিজে চা বানিয়ে খেতে পারি না......

অতীশ এগিয়ে এল ইতুর কাছে, তার হাত ধরে এক ঝটকায় টেনে তুললো। —চল্ চল্, বাড়িতে ওসব আবদার করিস, চামচে করে মা তোর পায়েস খাইয়ে দেবে।

হঠাৎ ওকে 'তুই' বলার জন্যেই হোক কিংবা পায়েস খাওয়ানোর কথাতেই হোক, সব্বাই শব্দ করে হেসে উঠলো।

ইতু আর অসম্মতি জানালো না। ডেকচি তুলে নিয়ে অতীশ এগোতেই ইতুও পিছনে পিছনে ইচ্ছে করে একটু বেশি বেশি হেলেদুলে চড়াই বেয়ে হোগলা ছাউনীর দোকানটার দিকে উঠে গেল।

তেলেভাজার দোকানের উনোন তখন নিভে গেছে, চায়ের দোকানটা বললে, একটু ঘুরে আসুন বাবু, করে দিচ্ছি।

ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে। তার চেয়ে ব্রীজটার ওপর বেড়িয়ে এলে

হয়। একটু এগোলেই চওড়া ব্রীজ, তার ওপর থেকে নদী দেখা যাবে, দূরের স্টীমার। স্টীমারঘাটা ওপারে, স্টীমারের চিমনি বেয়ে ধোঁয়া উঠছে ভুস ভুস করে।

অতীশ বললে, চলুন ব্রীজের ওপর থেকে ঘুরে আসি।

ইতু হেসে বললে, আবার 'আপনি আজ্ঞে' কেন। 'তুই' বলুন, আমার তুই শুনতে খুব ভাল লাগে।

অতীশ ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে ইতু।

ইতু হেসে উঠে বললে, এর পর কমা না ফুলস্টপ?

—মানে?

—মানে দারুণ দেখাচ্ছে বলে একটু পরে আবার বলবেন না তো 'ইতু তোকে আমি ভালবাসি', 'ইতু তোকে আমি বউ করবো', ওইসব?

কৌতুকে কৌতূহলে চোখ নাচালো ইতু।

—একটা কাজ করবেন? আবার 'আপনি' বললো অতীশ।

ইতু বললে, 'উঁহুঁ, তুইটাই গ্র্যান্ড!

অতীশ চোখ টিপে বললে, ঠিক হ্যায় একটা মজা করবি? একটু থেমে বললে, তুই যা শাট্ শাট্ টেবল টেনিসের ব্যাট দিয়ে কথা ছুঁড়িস, তুই পারবি না।

ইতু হাসলো।—শুনি আগে।

—আমরা চল্ এমন একটা ভান করবো, যেন ভীষণ প্রেম হয়ে গেছে আমাদের।

এবার শব্দ করে হেসে উঠলো ইতু। বললে, দারুণ হবে। কিন্তু আমি তা হলে কি বলবো? আপনি-আপনি?

অতীশ এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে, না, তুই আমাকে তুমি বলবি। খুব ন্যাকা ন্যাকা গলায়!

দীপক ভাবলে, সোমনাথ আর নন্দিতাও নিশ্চয়ই তার মত হতে চাইছে। অথচ ওরা দুজনই এত লাজুক, সেটুকু পরস্পরকে ইশারা ইঙ্গিতে বোঝাবার সাহসও নেই ওদের। তার জন্যে ওদের ওপর ও একটু বিরক্তও হচ্ছিল। সময় ফুরিয়ে আসছে। সন্ধ্যে হলেই, সাতটা বাজতে না বাজতেই ওরা সকলেই হয়তো ফিরতে চাইবে। যত দুঃসাহস তো ওদের এই সময়টুকু। তারপর আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করবে, অন্তত রাখী আর নন্দিতা। আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই যেন সব ঠিক আছে। মেয়েদের বাপ-মা'রা এত বোকা হয় কেন বুঝতে পারে না।

আসলে তো দীপক নিজেই একটু একা হতে চাইছিল রাখীর সঙ্গে।

তবু নন্দিতাকে বললে, ভাবছেন আমরা দুজন কেন ডিস্টার্ব করছি অকারণ, এই তো! যান, দুজনে গিয়ে গাড়িতে বসুন।

নন্দিতা ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। বললে, ও মা, ছি ছি, ওরকম বলবেন না।

দীপক হেসে বললে, সোমনাথ হয়তো চটছে, কে জানে। না, আমরাই বরং—

বলে রাখীকে ডেকে নিজে গিয়ে গাড়িতে বসলো। আর রাখী তখনো গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, চাপা গলায় বলে উঠলো, এই দ্যাখো দ্যাখো।

দীপক ফিরে তাকিয়ে দেখলো ইতু আর অতীশ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে ব্রীজের দিকে। দুজনে হাত ধরাধরি করলো, হাত না ছেড়েই তারা একবার পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, দু'টি হাত একটি সরল রেখা হয়ে যাচ্ছে, আবার দুজনে কাছে চলে আসছে। পাশাপাশি। একবার দূরে দূরে, একবার কাছে কাছে, যেন একটা ব্যালে নাচের জুড়ি। ফাঁকা ব্রীজ, ডুবন্ত সূর্যের আকাশ, নীচে ছলছল জল সেই নাচের ব্যাকগ্রাউন্ড।

রাখী কুলকুল করে হেসে উঠলো।—ওদের বোধহয় ভালবাসা হয়ে গেছে!

দীপক তাদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, কিন্তু আমাদের বোধহয় এখনো হয়নি।

রাখী দীপকের হাতের ওপর একটা জোর চিমটি কাটলো, তারপর ফ্যামিলি গ্রুপের দিকে ছুটে গেল।—আরে, ওরা রুমাল চোর খেলছে।

ঢিলে কুর্তা, তার মা, মিষ্টি বৌটাও এসে জুটেছে, আর টমটমকেও বসিয়ে দিয়েছে ওরা। রাখী দীপককে ফেলে রেখে ছুটে গেল। গিয়ে ভিড়ে গেল ওদের দলে।

সোমনাথ ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে একটা ঘাসের শীষ্ দাঁতে কাটছিল। সামনে নন্দিতা হাঁটু মুড়ে বসে ঘাড় কাত করে ইতু-অতীশকে দেখছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল। সত্যি, মেয়েটা অদ্ভুত। সেই গাড়িতে ওঠার সময় থেকে ঠোক্কর দিয়ে দিয়ে কথা বলেছে অতীশকে, আর এখন রীতিমত প্রেমিক-প্রেমিকা। ব্রীজের রেলিঙে কনুই রেখে নীচে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখান থেকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যাচেছ না। তবু যেমন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে কথা বলছে, যেন কত গাঢ় পরিচয়। অথচ নন্দিতা আর সোমনাথ এখানে গাড়িটা থেকে দশ পনেরো হাত দূরে, যে-কোনো কথা ওরা এখন বলতেও পারে, কিন্তু নন্দিতা কথাই খুঁজে পাচ্ছে না।

—আপনি খুব কম কথা বলেন। আপনার বুঝি এই সব হৈ-হুল্লোড় একটুও ভাল লাগে না? সোমনাথ ধীরে ধীরে বললে।

নন্দিতা চোখ ফিরিয়ে সোমনাথের দিকে তাকালো, লাজুক হাসলো।—ভাল না লাগলে আসতাম এখানে! একটু থেমে বললে, আপনিও তো কম কথা বলেন।

সোমনাথ বললে, মেয়েদের সামনে এলেই আমি আর কথা বলতে পারি না।

নন্দিতা মুচকি হাসলো।—এই তো বেশ বলছেন। তারপর আবার ইতুদের দিকে তাকিয়ে বললে, দীপকদা কি ভাবছেন বলুন তো। আমার এত লজ্জা করছে!

—আমাদের কথা ভাবার সময় নেই দীপকের, আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন। ও এখন একা একা গাড়িতে বসে রাগে ফুলছে, আপনার বন্ধুটি ওকে ছেড়ে রুমাল চোর খেলছে বলে।

নন্দিতা তা জানে। এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওর আছে, তবু একা-একা পড়ে গিয়ে অস্বস্তি লাগছিল। ওর আরো খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে, কলেজে গিয়ে রাখী আর ইতু নিশ্চয় ওর কথা, ওর এই সোমনাথের সঙ্গে বসে থাকা নিয়ে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অন্য মেয়েদের বলবে। সত্যি সত্যি সোমনাথ যদি ওর প্রেমে পড়ে যেত তা হলে এত লজ্জা পেত না। ও হয়তো নিজে বলতে পারতো না, কিন্তু অন্য সকলেই তো বেশ গর্ব করেই বলে।

নন্দিতার বেশ ভাল লাগছিল, কিন্তু ছেলেদের ও চেনে। আজকের এই সময়টুকুই সত্যি, আজকের এই মুহূর্তের ভাল লাগা। তার বেশি আর কিছুই ও আশা করে না। এর আগেও তো কারো কারো সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর। নির্জনে গিয়ে বসেছে, গল্প করেছে, তারপরই কেমন যেন ঘোর কেটে গেছে তাদের। ছেলেদের ও চেনে। ওদের যে যাবার জায়গা অনেক। প্রেম ওদের কাছে শুধু একটা ছোট্ট স্টেশন। এই সোমনাথই কোলকাতায় ফিরেই সব ভুলে যাবে। সিনেমা, পার্ক স্ট্রীট, খেলার মাঠ, আড্ডা। কে জানে, হয়তো পলিটিক্সও করে। কিছু না হোক রাজনীতির তর্ক। নেহাত ওরা ক'টা মেয়ে রয়েছে বলেই রাজনীতি ওঠেনি। রাজনীতি তো বাড়িতেও, বাবার সঙ্গে দিনরাত তর্ক করে দাদা, সব সময়ে প্রমাণ করতে চায় বাবাদের ধারণা সব ভুল। বাবা শেষকালে সব মেনে নেয়, নন্দিতা জানে, যুক্তির জন্যে নয়, দাদাকে বাবা ভীষণ ভালবাসে বলে। দাদা তর্কে জিতে গেলে বাবা ভিতরে ভিতরে বোধহয় খুশীই হয়। অপিসে কিছু ঘটলে কিংবা রেশনে চাল খারাপ দিলে বাবা মাকে বলে, অন্তু ঠিকই বলে।

নন্দিতা সেজন্যেই মাঝখানে পলিটিক্স করতে চেয়েছিল। ওটাও তো একটা যাবার জায়গা। অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়, নিজেকে ব্যস্ত রাখা যায়। কিন্তু বাবা মা কেউই পছন্দ করলো না।

প্রেমের জন্যেও নন্দিতা খুব ব্যস্ত নয়। কিছুর জন্যেই ও বোধহয় ব্যস্ত নয়। কারণ ওর ইচ্ছের তো কোনো দামই নেই। ইচ্ছে তারই থাকে যার ইচ্ছেপূরণের সম্ভাবনা আছে। ও বিয়ের কথা ভাবে না, কারণ ওরও মনে হয় হৈ-হুল্লোড়ের ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ। বিয়ে যেন একটা নতুন চ্যাপ্টার। ও পড়াশুনোর কথা ভাবে না, কারণ জানে, কোনোরকমে পাশ করার বেশি কিছু তো ওর ভাগ্যে নেই। পাশ করেও বিয়ে না চাকরি, না কি বেকার হয়ে বসে থাকবে, বাবা-মা'র ঘুম কাড়বে, তাও জানে না। ও এখন থেকেই মাঝে মাঝে চাকরির কথা ভাবে। একবার দীপককে বলেও ছিল হাসতে হাসতে, একটা চাকরি দিন না আমাকে আপনাদের আপিসে।

ওকে সোমনাথের একটু ভাল লাগছে, তা বুঝতে পেরেও নন্দিতা কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না। এর আগেও দু'তিনবার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু ছেলেগুলোর একটুও যেন ধৈর্য নেই। ওরা যেমন পাঁচ কাজে ছুটে বেড়ায়, হাঁপাতে হাঁপাতে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে সিগারেট কেনে, দুটো খদ্দের থাকলে সে-দোকান ছেড়ে অন্য দোকানে যায়, প্রেমের ব্যাপারেও এদের তেমনি একটা তাড়া-হুড়ো। তাড়াহুড়ো নন্দিতা একটুও পছন্দ করে না। সোমনাথকে অবশ্য তারই মধ্যে ভাল লাগছে, কারণ সোমনাথের মধ্যে সেই অধৈর্য ভাবটা নেই। কিন্তু নন্দিতা জানে ফিরে গিয়ে সোমনাথও বদলে যাবে। বড় জোর পাঁচ সাত দশ দিন। নন্দিতার মনে হবে 'কি পেয়েছি, কি পেয়েছি', তারপর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে আধঘণ্টা ধরে পায়চারী করবে, আগের দিনের ভুল-বোঝাবুঝির কোনো কথা ভেবে ওর কান্না পাবে, আরো আধ ঘণ্টা আশায় আশায় অপেক্ষা করবে, চ্যাংড়া কিংবা আধবুড়ো একরাশ লোক পিছনে লাগবে, কারো চোখ কারো কথা ওকে রাস্তার মেয়ে বানিয়ে দেবে, অথচ পরের দিন এই সোমনাথই হয়তো হাসতে হাসতে বলবে, আরে সে এক কাণ্ড, দীপক জোর করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল।

নন্দিতা তাই কিছু আশা করে না, কিছু পেলেও কুড়িয়ে নিতে সাহস হয় না। নিজেকে এগিয়ে দিয়েও দেখেছে, নিজেকে পিছিয়ে এনেও দেখেছে। এই ছেলেগুলো কেমন যেন। খুব অল্পেই এরা অধৈর্য হয়, খুব অল্পেই এদের সাধ মিটে যায়। মা একালের ছেলেমেয়েদের সব কিছুতেই দোষ দেখে। যেন ছেলে আর মেয়ে একই টাকার দুটো পিঠ। নন্দিতার ভাবলেও কষ্ট হয়। মা জানে না, ছেলেগুলো একেবারে অন্যরকম। এদের একটুও বোঝা যায় না। ওরা শুধু জেনেছে মেয়েরা খারাপ, মেয়েরা খারাপ। আগেকার দিনের থুত্থুরে বুড়োগুলো ঠিক তাই ভাবতো।

—আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে ভালবাসেন। সে ভদ্রলোককেও আনলেন না কেন। সোমনাথ হঠাৎ বললে।

নন্দিতা নিজের গভীর থেকে চমকে বেরিয়ে এল। মৃদু হেসে বললে, তিনি আসতে চাইলেন না।

—সেজন্যেই আপনাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে, কেমন যেন দুঃখী দুঃখী।

নন্দিতা ঈষৎ হেসে সোমনাথের দিকে তাকালো। চাপা কষ্ট আর স্পষ্ট হাসিতে মিলেমিশে ওর চোখের পাতা সদ্য উড়তে শেখা পাখির ডানার মত

এলোমেলো হয়ে গেল। বাঁকা ভাবে বললে, আপনি দেখছি ভিতর অবধি সব পড়তে পারেন।

সোমনাথ আরেকটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে নিয়ে একবার তাকালো নন্দিতার মুখের দিকে। অপ্রতিভের মত হাসলো।—আপনার মন তাই সারাক্ষণ সেখানেই পড়ে আছে।

নন্দিতা হাঁটুর মধ্যে থুতনি রেখে চোখ দুটো সোমনাথের চোখের দিকে তুললো। বললে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

সোমনাথ বললে, ভদ্রলোক খুব লাকি।

নন্দিতাকে এর চেয়েও অনেক ভালো ভালো মন-ভোলানো কথা আরেকজন বলেছিল। সেজন্যই নন্দিতা ক্রমশঃ ভীরু হয়ে যাচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। নন্দিতার কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। তাই বললে, চলুন ওদের রুমাল চোর খেলা দেখি।

বলে উঠে পড়লো। সোমনাথও।

আর রাখী ওদের দেখেই বলে উঠলো. বসে পড় নন্দিতা, বসে পড়।

রাখীর কথা ভাবতে ভাবতে, অর্থাৎ ভিতরে জ্বলতে জ্বলতে দীপক কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখলো, হাইওয়ে থেকে ঢালু রাস্তা বেয়ে অতীশ আর ইতু নেমে আসছে। পিছনে পিছনে সেই ময়লা ইজের-পরা কালোকুলো বাচ্চাটা। ডেকচিটা তার মাথায় গামছার বিঁড়েতে বসানো।

ইতুর দিকে আবার তাকালো দীপক। মনে মনে বললে, সুন্দর ফীগার মেয়েটার। এর আগেও মাঝে মাঝে ওর ইতুকে ভাল লেগেছে।

ওদের আসতে দেখে দীপক গাড়ি থেকে নেমে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরাও এসে পড়লো।

আর রাখী নন্দিতাদের ডাকতেই তারাও খেলা ছেড়ে চলে এল।

রাখী আর অতীশ খাবারগুলো নামালো একে একে। জলের ফ্লাস্কটা শুধু সোমনাথ নামালো। এসব ও ঠিক পারে না, কিন্তু নেহাত কিছু একটা না করলে খারাপ দেখায় বলেই একটু হাত ঠেকালো।

প্লেট চামচ হাতা নামিয়ে আনলো নন্দিতা আর রাখী।

দীপক চুপচাপ বসে আছে গম্ভীর মুখে। রাখী ইতুর কানে কানে বললে, রেগে ফায়ার। বলে হাসলো ঠোঁট টিপে।

অতীশ চটপট বসে পড়ে বললে, মেয়েরা সব সার্ভ করবে, আমরা কেবল খেয়ে ধন্য করবো তাদের।

রাখী শুধু বললে, ঈস্।

ইতু দীপককে উদ্দেশ করে বললে, বাড়িতে তো ও-কাজ বাঁধা আমাদের, বিয়ের পরও তাই। আজ অন্তত আপনারা সার্ভ করুন, আমরা বসে বসে খাই। কি বলিস রাখী।

বলে অতীশের পাশে গিয়ে বসে পড়লো অতীশের গায়ে হেলান দিয়ে।

রাখী তা দেখে অবাক হবার ভান করে চোখ বড় বড় করলো, ইতুর চোখে চোখ রাখলো।

বললে, এতদূর!

ইতু হেসে উঠলো।—আমার ভাই লুকোচুরি ভাল লাগে না। যা সত্যি তা লুকোবো কেন। অতীশ কি-সব বললো ফিসফিস করে, তোরা কি যে বলিস বুকের ভেতর হয়-টয়, মনে হলো সে-রকম কি যেন হচ্ছে-টচ্ছে, ব্যস্। বলেই শব্দ করে তুড়ি দিল ইতু।

অতীশ প্রতিবাদ করলো।—মিথ্যে কথা, তুই তো গুন-গুন করে গান গাইলি, গানে গানে কি-সব বোঝাতে চাইলি, তারপর তো আমি...

অতীশের কাঁধের ওপর পিঠের ভর দিয়ে বসেছিল ইতু, ও ঝট্ করে সরে সামনাসামনি বসলো।—রিয়েলি? তারপর দীপকের দিকে ফিরে বললে, জানেন, আমাকে হঠাৎ বললে, ইতু তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। 'ইতু, তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো না', ব্রীজ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বে বলে ভয় দেখালো...

সকলেই হেসে উঠলো। রাখী বললে, তোর সবই অদ্ভুত।

আর অতীশ বুঝতে পারলো না, ইতু প্ল্যানমতো অভিনয়ের দিকেই এগোচ্ছে, না ওকে সকলের সামনে ডোবাতে চায়।

দীপকের কিন্তু ইতুর সঙ্গে অতীশের এই ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগছিল না। মুখে উৎসাহ দিলেও দীপকের মনের মধ্যে একটু খচখচ করছিল।

নন্দিতা কোনো কথা বললো না। কেউ সার্ভ করছে না দেখে নিজেই প্লাস্টিকের প্লেটগুলো সব হাতে হাতে ধরিয়ে দিল।

রাখীর খুব ভাল লাগলো দেখে যে, দীপক সব হিসেব করে ব্যবস্থা করে এনেছে। কিন্তু প্লেটে মাংসের টুকরো পড়তেই রাখীর চোখ পড়লো কালোকুলো বাচ্চা ছেলেটার দিকে। বললে, এখন যা-না, পরে আসবি।

ছেলেটা লোভের চোখ দিয়ে যেন মাংসের স্বাদ নিচ্ছিল। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর রোঁয়া-ওঠা বিচ্ছিরি একটা কুকুরকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে দীপক একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারলো। পাথরটা ওর ভেতরের রাগ। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে চিৎকার করে দূরে সরে গেল। তবু সেখান থেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো জুলজুল চোখে।

খাওয়াদাওয়া তখন কমপ্লিট। ফ্রায়েড রাইসের কাগজের প্যাকেটগুলো ইতস্তত ছড়ানো, ডেকচিতে চিকেন এবং বেশ কিছু ফ্রাই বাড়তি হয়ে গেছে। ফ্রায়েড রাইসও কিছু কিছু।

রোঁয়া-ওঠা কুকুরটা মার খেয়ে দূরে দূরে ঘুরছিল, লোভে লোভে তাকাচ্ছিল। ইজের-পরা তিন-চারটে কালোকুলো ছেলেও কোত্থেকে এসে হাজির হলো কে জানে। একটা ন' বছরের মেয়ে, খালি গা, কোমরে কালো সুতোয় মাদুলী ঝুলছে, কানে পিতলের মাকড়ি।

ইতু ততক্ষণে ছেলেগুলোকে ডেকে বাড়তি খাবারগুলো বিলি করতে লেগে গেছে। কাগজের প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা, আর ইতু চামচে করে তুলে তুলে দিচ্ছে।

অতীশ একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠলো, আহা রে, মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

ইতু হেসে ফেলে চামচাটা তুলে তাকে মারতে যাওয়ার ভঙ্গি করলো, আর খানিকটা ঝোল গিয়ে লাগলো অতীশের শার্টে।

ফ্লাস্কে যেটুকু জল ছিল, তাই ঢেলে দাগটা তুলতে তুলতে অতীশ বললে, বাঁধিয়ে রেখে দিলে হতো। রোজ সকালে উঠে একবার করে দেখতাম, আর তোর কথা মনে পড়তো।

রাখী হেসে উঠে বললে, মনে পড়ার মত আর কিছুই বুঝি জোটেনি আজ। একটু থেমে বললে, আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

ইতু অতীশ কেউই জবাব দিল না।

দোকানের ছেলেটা, যে চা এনে দিয়েছিল, ডেকচিটা বয়ে এনেছিল, তাকেও ডেকেছিল ইতু খাবার নেবার জন্যে। সে ঘাড় নেড়ে 'না' বললে, দূরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

দীপক তাকেই বললে, ডেকচি চামচ ধুয়ে আনতে পারবি?

ছেলেটা উত্তর দিল, কেন পারবো না। পয়সা দেবেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবো।

ছেলেটা জল আনতে চলে গেল।

এদিকে ইতুর খাবার বিলি করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা সকলে উঠে পড়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিয়ে এসে বসলো।

রাখীর চোখ পড়লো টমটমের দিকে। দেখলো, টলমল টলমল পায়ে টমটম ছুটে বেড়াচ্ছে, ঢিলে কুর্তার মেয়েটা তাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ মজা লাগলো রাখীর। আজকের দিনটাই ওর খুব ভাল লাগছে।

রাখী হঠাৎ উঠে টমটমের দিকে চলে গেল। বাচ্চা ছেলে ওর ভীষণ ভাল লাগে, ঐ রকম বাচ্চা দেখলে ও স্থির থাকতে পারে না।

কালোকুলো ছেলেগুলো তখনো আঙুল চাটছে।

ইতু তার ব্যাগ থেকে কমপ্যাক্ট বের করলো, ডালার আয়নায় নিজের মুখ দেখলো, তারপর পাফটা হাল্কা করে বুলিয়ে নিল গালে।

অতীশ পকেট থেকে ছোট্ট চিরুনীটা বের করে চুল আঁচড়াচ্ছিল, ইতু বললে, এই, চিরুনীটা একবার দাও...দিন তো।

দীপক চোখ গোলগোল করে বলে উঠলো, অ্যাঁ, এতদূর! তা আমাদের কাছে আর চাপা রেখে কি হবে, 'তুমি'ই চলুক না।

বললো বটে। কিন্তু ও নিজেই ইতুর দিকে একবার মুগ্ধচোখে তাকালো।

ইতু ভাব দেখালো যেন লজ্জা পেয়েছে। আসলে ও ইচ্ছে করেই বলেছে, যেন মুখ ফসকে 'দাও' বেরিয়ে গেছে।

ও আবার বললে, চিরুনীটা দিন না!

অতীশ চিরুনীটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, তোর মাথায় আবার উকুন নেই তো!

ইতু এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল।—চাই না আপনার চিরুনী। বলে চিরুনীটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল অনেকখানি দূরে।

অতীশ কিন্তু সেটা আর আনতে গেল না। আর তাকে রাগাবার জন্য ইতু অতীশের দেশলাইটা তুলে নিল ঘাসের ওপর থেকে, একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে শুরু করলো।

বেশ কয়েকটা কাঠি জ্বেলে নষ্ট করার পর অতীশ দেশলাইটা কেড়ে নিল।

ইতু হেসে বললে, হলো না। একটা দেশলাইয়ের মায়াও ছাড়তে পারছেন না। তাহলে তো আমার জন্যে কিছুই পারবেন না।

অতীশ গম্ভীর মুখে বললে, সন্ধ্যের পর দেশলাই জ্বেলে তোর মুখ দেখতে হবে না? তাই।

সবাই হেসে উঠলো। আর নন্দিতা ধীরে ধীরে উঠলো, শাড়ির কুঁচি ঠিক করলো, ধুলো ঝাড়লো শাড়ির, তারপর ইতু যেদিকে চিরুনীটা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়েই গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হলো। ওরা ফিরে তাকিয়ে দেখলো নতুন ফিয়েট গাড়িটায় সেই মিষ্টি বৌটা উঠে বসেছে। স্টিয়ারিঙে সেই চার-আনা টাক ভদ্রলোক।

বিকেলের রোদ পড়ে গেছে, সন্ধ্যে হয়-হয়। ভদ্রলোক সেজন্যেই বোধহয় চলে যাচ্ছেন।

গাড়িটা ঘাসের ওপর দিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক সেকেন্ড দাঁড়ালো। মিষ্টি বৌটি নন্দিতার দিতে তাকালো, হাত নাড়লো। নন্দিতাও। তারপর গাড়িটা স্পীডে হাইওয়ের দিকে উঠে গেল।

রাখীও ওদের চলে যেতে দেখে টমটমকে কোলে নিয়েই এগিয়ে এসেছিল, পিছনে পিছনে সেই স্ল্যাক্স্ আর ঢিলে কুর্তা। কিন্তু সুইট বৌটার সঙ্গে চোখাচোখিও হলো না তার।

তারা চোখের আড়াল হয়ে যেতেই ঢিলে কুর্তা রাখীর গায়ে গা লাগিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বলুন না রাখীদি, বলুন না।

রাখী হেসে উঠে বললে, রুমা বলছে আমাদের সঙ্গে রুমাল-চোর খেলবে।

অতীশ বললে, রুমা! বেশ নাম তো। তারপর একটু থেমে বললে, আমাদেরও খেলতে নেবে তো?

রুমা লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললে, কেন নেব না। বরং ভালই তো, খুব বড় সার্কেল না হলে খেলা জমেই না।

রুমাকে খুশী করার জন্যেই সকলে রাজী হলো। শুধু দীপক শুকনো হাসি হাসলো। ও ভিতরে ভিতরে চটে যাচ্ছিল। তখন একবার ওকে একা ফেলে রাখী চলে গিয়েছিল রুমাদের কাছে খেলার নাম করে। দীপক অবশ্য জানে, সে শুধু ওকে

চটাবার জন্যেই। ইতুর ব্যাপারটাও দীপকের ভাল লাগছিল না। কেন, ও নিজেও বুঝতে পারছিল না। অতীশের সঙ্গে তার একটু ঘনিষ্ঠতা হোক্, সে তো দীপকও চেয়েছিল। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা বাড়ছে দেখে দীপকের ভাল লাগছিল না।

এদিকে রুমা, রাখী তখন সত্যি সত্যি সকলকে গোল করে বসিয়েছে। রুমা রুমাল হাতে নিয়ে ঘুরছে আর ঘুরছে। তার দিকে তাকিয়ে সকলেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। হো হো করে হাসছে সবাই, পিছনে হাত দিয়ে দেখছে রুমাল ফেলে গেছে কিনা।

নন্দিতার হাতে রুমাল ঠেকতেই ও হাসতে হাসতে উঠে পড়লো। এবার রুমা বসেছে। নন্দিতা ঘুরছে। নন্দিতার পর রাখী। নন্দিতা অত হিসেব করেনি। কিন্তু রাখীর জায়গায় বসতেই ও লক্ষ্য করলো ওর পাশেই সোমনাথ। ওর কেমন একটু লজ্জা-লজ্জা লাগলো। আবার ভালোও লাগলো।

রাখী ঘুরছে ঘুরছে, তারপর টমটমের পিছনে ও রুমাল রেখে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার এসেই তার পিঠে মিথ্যে মিথ্যে দুটো চাপড় দিয়ে বললে, ওঠো টমটম, ওঠো। টমটম উঠলো না।

পরের বার রাখী হাসতে হাসতে ইতুর পিছনে রুমাল ফেললো। আর ইতু উঠে ঘুরতে শুরু করতেই টমটমও ঘুরতে লাগলো। সব্বাই হেসে উঠলো হো হো করে।

ঘন ঘন পালটে যাচ্ছিল চক্রটা। দীপকের পাশে ইতু (দীপকের ভাল লাগলো), অতীশের পাশে ইতু, রাখীর পাশে দীপক, রাখীর পাশে অতীশ (অতীশের ভাল লাগলো), নন্দিতার পাশে সোমনাথ, নন্দিতার পাশে রুমা। রুমার পাশে টমটম।

খুব মজা লাগছিল ওদের। আর রাখী লক্ষ্য করছিল, কে কাকে জব্দ করার চেষ্টা করছে।

তারপর একসময় সব্বাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। রুমার মা রুমাকে ডাকলেন। টমটমকে নিয়ে রুমা চলে গেল। অনেকক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইলো, গল্প করলো।

ইতু হঠাৎ দীপকের দিকে চোখ রেখে বললে, কি মশাই, বাড়িটাড়ি নেই নাকি আমাদের? যেতে হবে না?

দীপক হাই তুললো ক্লান্তিতে। যেন ইতুর কথা ওর কানেই যায়নি এমন ভাবে বললে, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করার পর পেট ভরে খেয়ে, রুমাল-চোর খেলে এখন সকলেরই কেমন ক্লান্ত লাগছিল। বাড়ি ফেরার কথা কারো ভাবতেই ইচ্ছে করছিল না। কেউই ইতুর কথার পিঠে কিছু বললো না। আসলে ইতুর নিজেরও হয়তো বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না।

মাত্র তো এক ঘণ্টা সময় লাগবে যেতে। ন'টা সাড়ে ন'টা বেজে গেলেও ক্ষতি নেই। গিয়ে বড়জোর বাড়িতে একটা থমথমে আবহাওয়া দেখবে, কিংবা দুটো বাঁকা কথা। সে তো অনেক শুনেছে ওরা। তার ভয়ে এমন সুন্দর একটা দিনকে মাটি করতে ইচ্ছে হলো না কারো।

নন্দিতা চিরুনীটা খুঁজে নিয়ে এসে নিজের ব্যাগে রেখেছিল। মনে পড়তেই ইতুকে দিয়ে বললে, এই নে, রাগ করে ডাইনী সেজে থাকতে হবে না।

ইতু চিরুনীটা নিয়ে হাসলো, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, তোকে আজ যা প্যারাগন প্যারাগন লাগছে না! যতই সাজি, তোর পাশে ডাইনীই লাগবে।

অতীশ বললে, আমি একমত।

সঙ্গে সঙ্গে ইতু একটা চিম্‌টি কাটলো অতীশকে। অতীশ 'উঃ' বলে চিৎকার করে উঠলো।

দোকানের ছেলেটা ইতিমধ্যে ডেকচি চামচ সব ধুয়েমুছে কেরিয়ারে তুলে দিয়ে এসে দাঁড়ালো দীপকের কাছে। দীপক রাগের ভান করে ইতু নন্দিতার দিকে ইশারা করলো। বললে, দিদিমণিদের কাছে যা। প্রেম করবেন ওঁরা, পয়সা দেবো আমি?

নন্দিতা তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলতে গেল। শুধু বললে, দীপকদা, আপনি কিন্তু আজ যা-তা বলছেন।

দীপক তার আগেই হাত বাড়িয়ে নন্দিতার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে জীপ ফাসনার টেনে ব্যাগটা বন্ধ করে দিয়েছে।

পয়সা মিটিয়ে দিতেই ছেলেটা চলে গেল। আর তখনই ছেঁড়া খাকি হাফপ্যান্ট পরা ভিখিরি ছেলেটা এসে দাঁড়ালো হাত পেতে। বছর বারো বয়েস, কাজের কথা শুনেই সরে গিয়েছিল। দীপক ধমক দিয়ে বললে, যা ভাগ্।

ছেলেটা ওঁর আগে একবার রাখীকে ছুঁয়ে ভিক্ষে চেয়েছিল। সেজন্যে রাখীর গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল।

দীপক বললে, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, চল্ নদীর পাড় দিয়ে ঘুরে আসি। বলে গাড়ির কেরিয়ারে চাবি লাগাতে গেল।

আর ইতু হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো, আরে ব্বাস্, কি ঢাউস চাঁদ রে এখানকার। এ এক্কেবারে নেমন্তন্নবাড়ির গামলা।

সক্কলে তাকিয়ে দেখলো পড়ন্ত আলোয় সারি সারি নারকোল গাছের মাথার ওপর ইয়াব্বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে।

অতীশও থ হয়ে গেল দেখে। বললে, দারুণ! দুটো লোকও জাপটে ধরতে পারবে না মাইরি, এত্ত বড়।

রাখী বলে উঠলো, লাভলি! লাভলি!

নন্দিতা নীচু গলায় বললে, আজ বোধহয় পূর্ণিমা।

ইতুর হাতে চওড়া ব্যান্ডে বেশ বড় সাইজের ঘড়ি। রাখীর হাতের ঘড়িটা ছোট। দীপক ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে নাকি ওটা দেখতে হয়!

নদীর পাড়ের দিকে যেতে যেতে ইতু ঘড়ি দেখলো, রাখী ঘড়ি দেখলো। তারপর ইতু আস্তে আস্তে রাখীকে বললে, এখনো অনেক সময় আছে। রাখীও ফিসফিস করলে, ন'টায় কিন্তু বাড়ি পেঁছিতেই হবে। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গিয়ে রাখীর মুখে কেমন একটা ভয়-ভয় ছাপ পড়লো। আর ইতু বাইরে অতটা দেখালো না বটে, কিন্তু ফিসফিস করে বললে, লেটেস্ট সাড়ে ন'টা। তারপর আর ঢুকতেই দেবে না বাড়িতে।

শুধু নন্দিতাকে দেখে মনে হলো বাড়ির কথা ও ভাবছেই না। ওর মন যেন একটা মুগ্ধ প্রজাপতি হয়ে উড়ছে।

নদীর ধারে পেঁছে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা জলের কাছ অবধি এগিয়ে গেল দৌড়তে দৌড়তে। রাখী আগে আগে, পিছনে ইতু। দীপক, অতীশ, সোমনাথও দৌড়লো।

ওপারে বিরাট একটা চাঁদ, আলো নিভে আসছে দিনের, নদীর ওপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে একটা নৌকো আসছে এদিকেই, আর কি মোলায়েম হাওয়া। নন্দিতার মনও ফুর্তিতে নেচে উঠলো। রাখী-ইতুদের দেখে নন্দিতাও দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করে বললে, ইতু, তুই সাঁতার জানিস না, সাবধান।

অতীশ পিছন থেকে চিৎকার করলো, ইতু, পারিস তো জলে নেমে ডুবে যা, তোকে বাঁচানোর একটা স্কোপ দে।

ইতু মুখের সামনে দুটো হাতকে মাইক বানিয়ে চিৎকার করে বললে, আমি নিজে ডুবি না স্যার, আমি শুধু ডোবাই।

দীপক চিৎকার করলো, রাখী জলের অত কাছে যেও না।

সোমনাথের মন থেকেও জড়তা কেটে গেল। ও চিৎকার করলো, দীপক, নৌকো চড়বি?

রাখী চিৎকার করে বললে, আমি জলে পা ডুবিয়ে বসবো, ডুবে গেলে বাঁচাবেন তো অতীশদা!

অতীশ চিৎকার করে বললে, দীপক তাহলে চটে যাবে। আমি শুধু ইতুকে বাঁচাবো।

রাখী হেসে উঠে চিৎকার করে প্রশ্ন করলো, দীপ যখন ডোবাবে তখন বাঁচাবে কে মশাই?

অতীশ চিৎকার করে বললে, আমি আমি।

বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ওরা চতুর্দিকে ছুটে বেড়ালো, চিৎকার করে করে পরস্পরের সঙ্গে কথা বললো, আনন্দে ওদের মন কাশফুল হয়ে দুললো, তারপর ক্রমশ সকলেই কাছাকাছি এসে পড়লো ফেরীঘাটের দিকে যেতে যেতে। অতীশ গলা ছেড়ে গান শুরু করলো। ইতু ধীরে ধীরে রাখীকে বললে, আরে, দারুণ গায় তো! নন্দিতা অতীশের সঙ্গে গলা মেলালো! উছলে পড়ে আলো। ইতু যোগ দিল, ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।

রাখী খুব আস্তে আস্তে গাইছিল, ও গান ভাল জানে না। সোমনাথ একেবারেই জানে না।

রাখীর শুধু মনে হলো, সত্যিই চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে। সেই বিরাট চাঁদটা এখন ছোট হয়ে গেছে, আর ছায়া ছায়া নদীর তট, গাছগাছালি, রাস্তা, ব্রীজ, নদীর জল জ্যোৎস্নায় ভিজে গেছে। ওরা নিজেরাও।

যেন ক্ষণিকের মধ্যে ওদের মনগুলো বদলে গেল। নরম, শান্ত, গভীর। চাঁদের আলো ওদের মন থেকে সঙ্কোচের পর্দা সরিয়ে দিল।

দীপক হঠাৎ কখন ঝপ্ করে বালির ওপর বসে পড়েছে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসেনি, রাখী তা লক্ষ্য করেনি। ও হঠাৎ দীপককে দেখতে না পেয়ে ফিরে তাকালো। দূরে বালির ওপর তার ছায়াশরীর দেখা গেল। রাখী টের পেয়েছে, ওকে একা না পেয়ে মাঝে মাঝেই সারাটা বিকেল রেগে যাচ্ছিল দীপক। সে-কথা ভেবে ওর হাসি পেল। অথচ ওর নিজেরও একা হতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

ইতু হাসতে হাসতে কানে কানে বললে, যা রাখী যা, তা না হলে ফেরার সময় অ্যাকসিডেণ্ট করবে।

রাখীর মনে হলো অ্যাকসিডেণ্ট নিয়ে ঠাট্টা না করলেই পারতো ইতু। ও ইতুর সঙ্গে একটু একটু করে পিছিয়ে পড়তে লাগলো। সামনে অতীশ, নন্দিতা, সোমনাথ।

তারপর রাখী হঠাৎ ইতুর হাতে একটু চাপ দিয়ে দীপকের দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

দীপক নিশ্চয় খুব রেগে গেছে। দীপকের রাগ দেখতে ওর খুব মজা লাগে।

ইতুকে একদিন বলেছিল সে-কথা। দীপক রেগে গিয়ে যখন গম্ভীর হয়ে যায় তখন কিন্তু খুব কষ্ট হয় রাখীর। দীপক হয়তো ভাবে, রাখী ওকে একটুও ভালবাসে না। ধরা না দিলেই যেন সেটা আর ভালবাসা নয়। দীপক কেন বোঝে না, রাখীর কেমন ভয়-ভয় করে, কেবলই মনে হয় ওর কাছে হারলেই হারাতে হবে।

সেই টিকিট নিতে গিয়ে তো দীপককে ভুলেই গিয়েছিল। নিরঞ্জনকে খুশী করে নিরঞ্জনের কাছে নিজের দাম বাড়াতে চেয়েছিল। প্রেম যে অন্য কিছু ও তখন জানতোই না।

বোধহয় দু' তিনমাস পার হয়ে গিয়েছিল। ও ভাবতেই পারেনি দীপক ওকে এতদিন বাদে দেখে চিনতে পারবে।

বিকেলে সিনেমা দেখে ইতুকে বাস-স্টপে ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একখানা গাড়ি ওকে পার হয়ে চলে গেল, যে চালাচ্ছিল সে ওর দিকে তাকালো। রাখী প্রথমটা চটেই গিয়েছিল। গাড়িওয়ালা লোকগুলো কি যেন ভাবে, যেন পায়ে-হাঁটা যে-কোনো মেয়ে ওদের কাছে লিফ্‌ট্ নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে।

গাড়িটা ওকে পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ ঘ্যাচাং করে থেমে পড়লো। হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ শুনে এক পলক তাকিয়েই রাখী অন্যদিকে মুখ ফেরালো। ওর ভয় হলো লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই তার চোখ ওকে সস্তা করে দেবে।

কিন্তু গাড়িটা ফুটপাথ ঘেঁষে এল রাখীর পাশে পাশে। তারপর ডাক শুনলো রাখী।—শুনছেন! রাখী ফিরে তাকালো, ওর চোখ বললো চিনতে পারেনি।

দীপক হেসে বললে, আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।

রাখী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো একমুহূর্ত।

দীপক বললে, রেবাদির সঙ্গে আমার আপিসে এসেছিলেন, চ্যারিটির টিকিট, মনে পড়ছে না?

ঈস্, রাখীর কি খারাপ লেগেছিল দীপককে চিনতে পারেনি বলে। নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হলো।

তবু আমতা আমতা করে বললে, আপনি বোধহয় রোগা হয়েছেন একটু... সেদিন অন্যরকম পোশাক পরেছিলেন...আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।

দীপক হো হো করে হেসে উঠলো।—কিচ্ছু অন্যায় করেননি ভুলে গিয়ে। আমাদের কেউই মনে রাখে না, আপনি তো তবু চিনতে পেরেছেন শেষ অবধি।

দীপক গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে তারপর হাত বাড়িয়ে। আর রাখী একটুখানি ইতস্তত করে উঠে বসেছে।—আমি কিন্তু কাছেই নামবো।

দীপক গাড়ি চালাতে চালাতে বলেছিল, আমি আপনাকে পিছন থেকে দেখেই— মানে সন্দেহ হয়েছিল, ফিরে তাকিয়েই বুঝলাম আপনি।

রাখী সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল—দীপক ওর নাম, ওর কলেজের নাম, সেদিন যা যা বলেছিল সব মনে রেখেছে দেখে।

ও বলেছিল, আমি কিন্তু কাছেই নামবো। কিন্তু ওর নামতে ইচ্ছে হয়নি। ওর মনে হয়েছিল, ওকে মনে রাখার প্রতিদানে, সেদিনের কৃতজ্ঞতায় একটা দিন দীপকের ইচ্ছের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে। রাখী জানে না, সেটা ওর নিজেরই ইচ্ছে কিনা।

পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্টোরেণ্টে গিয়ে ওরা বসেছিল। দীপক অনর্গল কথা বলছিল, রাখীও অনর্গল কথা বলছিল। তারপর হঠাৎ কখন ওরা দুজনেই চুপ করে গিয়েছিল। সমস্ত কথা ওদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু পরস্পরের উপস্থিতিটা ওদের ভাল লাগছিল।

সেদিন মাঝপথে এক জায়গায় নেমে গিয়েছিল রাখী। দীপক ওর ঠিকানা জিজ্ঞেস করেনি, আবার কবে দেখা হবে জিজ্ঞেস করেনি। শুধু বলেছিল, কারো সঙ্গে আজ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল না তো! তা হলে মনে মনে নিশ্চয় খুব গালাগাল দিয়েছেন। বলেছিল, আমার সন্ধ্যেটা কিন্তু খুব সুন্দর কাটলো।

ব্যস্। বাড়ি ফিরে কি যেন হয়ে গেল রাখীর। অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারলো না। জানালায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ রাতের অন্ধকার দেখলো।

তিনটে দিন ও কোনোরকমে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন টেলিফোন ডিরেক্টরীর পাতা উল্টে উল্টে দীপককে ফোন করে বসলো—কে বলছি বলুন তো?

—রাখী। দীপক একটুও দ্বিধা না করে বললে।

সেই দিনটার কথা আজ একবার মনে পড়েছিল রাখীর। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে-কথা ওর আবার মনে পড়লো।

নদীর ধারে বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল দীপক। রাখীকে কাছে আসতে দেখেও কোনো কথা বললো না।

রাখী হাসলো।—খুব রেগে গেছ তুমি, তাই না? কিন্তু কি করে আসি বলো তো?

দীপক গাঢ় গলায় বললে, চাই না, চাই না তোমাকে, আমাকে একা থাকতে দাও।

নৌকোটা ঘাটে এসে ভিড়লো। জনকয়েক গ্রাম্য লোক মালপত্তর নিয়ে নেমে অন্ধকার ঝোপ ঝাপ গ্রামটার দিকে হেঁটে গেল।

ওরা দেখলো মাঝিটা নৌকোয় বসে বসেই বিড়ি টানছে। নৌকোর মধ্যে একটা হারিকেন দুলছিল, সেটা নিভিয়ে দিল সে।

ওরা বসে ছিল। হঠাৎ চমকে উঠলো ইতু। ফিরে তাকিয়ে দেখলো বছর বারো বয়সের ভিখিরি ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে কখন। ইতু হেসে উঠলো।—এখানেও? নন্দিতা ব্যাগ খুলে পয়সা দিল তাকে, এই ভাল লাগার সময়টুকু থেকে ওকে সরিয়ে দেবার জন্যে। আর অতীশ ছেলেটাকে দীপকদের দিকে দেখালো।—ঐখানে যা, ঐখানে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি সেদিকে চলে গেল।

ইতু সোমনাথ অতীশ নন্দিতা গোল হয়ে বালির ওপর বসেছিল। নন্দিতা তার পায়ের ওপর ভিজে বালি চাপিয়ে সুরুৎ করে পা টেনে নিয়ে একটা ঘর বানালো।

ইতু ফিরে তাকিয়ে দীপকদের একবার দেখলো। অন্ধকারে রুপোর জল মেখে ওদের শরীর দুটো সিলুয়েট ছবির মত দেখালো। স্পষ্ট বোঝা গেল না, মনে হলো রাখী দু হাত পিছনে স্ট্যান্ড বানিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে, তার কোলে মাথা দিয়ে দীপক শুয়ে আছে। দীপকের ট্রাউজার্সের একটা পা বালির ওপর ট্র্যাংগল বানিয়েছে, আরেকটা পা সরল রেখা। দৃশ্যটা ইতুর খুব মিষ্টি লাগলো। অতীশ তার পাশেই, ইতু তাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে দীপকদের দেখালো। নন্দিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো। সোমনাথ মৃদু হেসে বললে, কবিতা।

ইতু ন্যাকামির গলায় সুর টেনে বললে, আমরাও কবিতা হবো। বলেই হেসে ফেললো।

নন্দিতা কুলকুল করে হাসলো, বাব্বা, কত ঢং তুই জানিস।

অতীশ বললে, ভিড়ের মধ্যে কবিতা হয় না। তুই তো আমার সংগে একা হতেও ভয় পাস।

ইতু একটা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কথায় গভীর হতাশার সুর মাখানোর চেষ্টা করে বললে, হায় রে, কাকে শেষ পর্যন্ত হৃদয় দিয়ে বসলাম! মুখের কথাতেও যে বুঝতে পারে না সে নাকি বুকের ভেতর পড়ে দেখবে।

অতীশ হেসে ফেলে বললে, চল্ তাহলে নৌকোয় একটু ঘুরে আসি।

—না বাবা, আপনাকে বিশ্বাস নেই। ইতু বসে রইলো।

—তোর কানে কানে ফিসফিস করে কত কি বলতে হবে যে।

সোমনাথ আর নন্দিতা প্রায় একই সংগে বলে উঠলো, আমরা যে শুধুই ভিড়।

অতীশ সত্যি সত্যি মাঝির সংগে দরদাম করলো। রফা হতেই ইতুকে বললে, চল্ চল্।

—না বাবা, আপনাকে বিশ্বাস নেই। ইতু বসে রইলো।

অতীশ ওকে কাতুকুতু দিতেই ইতু হাসতে হাসতে উঠে পড়লো। এক পা এগিয়ে দিয়ে নৌকোয় উঠলো টাল সামলাতে সামলাতে। বললে, ডুবে গেলে বাঁচাবেন তো!

অতীশ ইতুর পাশে গিয়ে বসলো। তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে

ফিসফিস করে বললে, আমরা দু'জনেই বাঁচবো।

নৌকো ছেড়ে দিল। নৌকোর মুখটা ঘুরে গেল। ওরা দু'জনই নন্দিতা আর সোমনাথের হাসির শব্দ শুনতে পেল।

মাঝি একমনে দাঁড় টেনে চলেছে, ওরা দু'জনে ছইয়ের আবছা অন্ধকারে। নদীর ওপর ছোট ছোট ঢেউগুলো চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। বালির তট দুধের মত, দূরে দূরে গাছপালা কালো তুলির টান, পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোর টুকরো। ব্রীজটা এখান থেকে একটা অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল মনে হচ্ছে।

অতীশ একটু চাপা গলায় হঠাৎ বললে, ঠাট্টা নয় ইতু, আমি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

ইতু মৃদু হেসে বললে, কি রাফ গলা, ঐভাবে বলে নাকি, আরো মিষ্টি করে বলতে হয়।

অতীশ দমে গেল। চাপা রাগ থেকেই যেন বললে, তোমার তো অনেক অভিজ্ঞতা, তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও কখন কি বলতে হয়।

ইতু অতীশের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। তাকিয়ে রইলো এক পলক। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমি খারাপ, সত্যি খুব খারাপ মেয়ে আমি। কিন্তু ওর গলার স্বরে অভিমান উঁকি দিল।

অতীশ ওর হাতখানা নিজের দু'হাতের মুঠোয় তুলে নিল। বললে, আমি খারাপ ভাল বুঝি না। তোমাকে খারাপও বলি না, ভালও বলি না, তুমি অন্য কিছু।

ইতু অতীশের চোখের দিকে আবার তাকালো, তাকিয়ে রইলো। আবছা অন্ধকারে ওদের দু'জনের চোখজোড়াই শুধু ওরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

ইতু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, আপনার আজ কি যেন হয়েছে।

অতীশ বললে, ভালবাসা কি, তুমি একটুও বোঝো না।

ইতু বললে, ভালোবাসলে কি করতে হয়? বলেই অতীশের গালে হঠাৎ ঠোঁট ঠেকিয়ে 'চুক' করে শব্দ করলো।—এই? ভালবাসা বলতে ছেলেরা তো এইটুকুই জানে!

অতীশ ততক্ষণে ইতুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনেছে। মাঝিটা যেন মানুষই নয়।

কিন্তু মাঝিটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, টাল করবেন না বাবু, টাল করবেন না।

ওরা দেখলো নৌকোটা দুলে উঠছে।

—ছি ছি, ও কি ভাবলো! ইতু ফিসফিস করে বললো। ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে অতীশের যে হাতখানা নেমে এসেছিল সেই হাতখানাকে ও সরিয়ে দিতে গিয়েও মুঠোর মধ্যে ধরে রইলো।

তারপর অতীশ ঠোঁট টিপে হেসে বললে, আর বোধহয় আমাদের অভিনয় করতে হবে না।

ইতু হঠাৎ হেসে বললে, আচ্ছা, এবার বলুন তো আমি কত নম্বর?

অতীশ বুঝতে পারলো না প্রথমে। পরক্ষণেই বুঝতে পেরে বললে, আমি কি গুনে রেখেছি? সকলের কথা আমার মনেও নেই।

ইতু বললে, আহা, গোপন করার কি দরকার। আমি ওসব কিছু মনে করি না। আমি নিজে বাঁধন মানি না, কাউকে বেঁধেও রাখি না।

অতীশ চুপ করে রইলো। কথাটা বোধহয় ওকে আঘাত দিল। ও সারাটা দিন মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছে। ইতুর এই সপ্রতিভ হাঁটাচলা, ব্যবহার, ওর কথার

ঝলক, গায়ে ঠেস দিয়ে একান্ত হয়ে সকলের সামনে বসা, কিংবা সেই মুঠো করে চুল ধরে মাথা ঝাঁকানো—প্রতিটি মুহূর্ত ওর মনের ওপর দাগ কেটে গেছে। এমন কি ব্রীজের ওপর দিয়ে ওরা যখন হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল প্রেমিক-প্রেমিকার অভিনয় করতে করতে, তখনো অতীশের মনে হয়েছে, কোনোটাই অভিনয় নয়। তা হলে ওর এত ভাল লাগছিল কেন, যদি অভিনয়ই হবে!

তাই ইতুর কথায় ও আহত হলো। 'আমি বাঁধন মানি না, কাউকে বেঁধেও রাখি না।' অথচ অতীশ এইমাত্র একটি সুগন্ধির দীঘি থেকে ডুব দিয়ে উঠেছে। ওর সমস্ত শরীর-মন কেমন বাতাসের মত হালকা হয়ে বিদ্যুতের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। ও চাইছিল ইতু ওর একার হবে, ইতু ওকে বেঁধে রাখবে।

—ঢিলে কুর্তা স্ল্যাক্‌স্‌-পরা মেয়েটা কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেল, আলাপ করলে পারতেন। আমি তো ছিলামই। ইতু হেসে উঠলো।—এমনি করে তুড়ি দিয়ে ডাকলেই চলে আসতাম। ও আবার শব্দ করে তুড়ি দিল।

অতীশ কোনো কথা বললো না। ওর সমস্ত আনন্দ মাটি করে দিতে চাইছে ইতু।

—এই, তুমি আমাকে আর আদর করবে না? বলে অতীশের হাতটা ও নিজেই নিজের কাঁধের ওপর টেনে নিল। বললে, মুখ গোমড়া করে থেকো না। এই মুহূর্তটাই সত্যি, এটাকে নষ্ট করে কি হবে!

অতীশ বললে, আমি এই মুহূর্তটাকে চিরকালের করে তুলতে চাই।

ইতু হেসে উঠলো।—সব মুহূর্তগুলো মিলিয়ে তবে তো চিরকাল। আমি সবগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে ভালবাসি। যখন আমি না...ইতু উচ্ছল হয়ে হেসে উঠলো, বললে যখন থুথুড়ি বুড়ি হয়ে যাবো, আমার লুকোনো ঝাঁপি খুলে বসবো, গুনে গুনে দেখবো কতগুলো কড়ি জমেছে, কোন্‌টা কোন্‌টা কানাকড়ি আর কোন্‌টা খুউব দামী।

বলতে বলতে হঠাৎ আদুরে ভঙ্গীতে ইতু অতীশের গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। অতীশ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। ধীরে ধীরে বললে, তুমি একটা পাগল।

ইতু পরম নিশ্চিন্তে পরম আরামে অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ইতু যেন একটা ঘোরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তার হাত অতীশের বুকের উপর এসে থামলো, পুট পুট করে অতীশের শার্টের বোতাম খুলে দিল ইতু, তারপর তার গেঞ্জীতে ঢাকা বুকের ওপর মোলায়েম হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

অতীশের তখন ভীষণ ভাল লাগছে। একটু আগের সেই বিচিত্র নরম স্পর্শ। সেই ঘোলাটে উত্তেজনা এর কাছে কিছু না, কিছু না। অতীশের সেই মুহূর্তে মনে হলো দীপক কিংবা সোমনাথকে ডেকে বলে, ইতুর এই অতীশের বুকে হাত বোলানোর স্নিগ্ধ আনন্দের কাছে আর কোনো আনন্দ নেই।

নন্দিতা আর সোমনাথ যেমন বসে ছিল ঠিক তেমনি বসে রইলো। কিন্তু নৌকোটা ইতু আর অতীশকে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে যেতেই ওদের মনে হলো ওরা অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে। দুধের মত নদীর তট, এখন চাঁদ কোলকাতার মত ছোট হয়ে গেছে, তার আলো ঠিকরে পড়ে বালির পাড় সাদা দুধ, তার ওপর যেখানে ব্রীজের হালকা ছায়া পড়েছে, সেই জায়গায় দীপক আর রাখীকে অনেক ছোট দেখাচ্ছে।

নন্দিতার মনে হলো একটা বিশাল নির্জনতার পৃথিবীর মধ্যে ওরা দু'জন যেন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মনে হলো কিছু একটা ঘটাবার জন্যে ওরা যেন অপেক্ষা করছে।

—আমি জানতাম না, জানলে নির্ঘাত সে ভদ্রলোককে টেনে আনতাম।

নন্দিতা হাঁটুতে থুতনি রেখে চুপচাপ বসেছিল। ঠিক তখন যেভাবে সোমনাথের হাত থেকে টগর ফুলটা নিয়ে মাথায় গুঁজেছিল, সেই ভাবেই আবার উচ্ছল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর।

ও মৃদু হাসলো সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে।—আপনি বোধহয় বড্ড বেশি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

ওর মিথ্যে গল্পটা সোমনাথ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছে দেখে ওর খুব মজা লাগছিল। ওর মনে হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে ও যেন রাখী আর ইতু হয়ে উঠতে চাইছে।

সোমনাথ বললে, হতাশ নয়, হিংসে হচ্ছে। সে ভদ্রলোকটি কেমন, জানতে ইচ্ছে করছে।

নন্দিতা বললে, ভীষণ ভাল। খুব ভদ্র আর খুব শান্ত।

—আর নিশ্চয় খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেন।

নন্দিতা কৌতুকে হাসলো। বললে, না না, কথা নয়, তার মনটা খুব সুন্দর। কথা তিনি একেবারেই বলেন না, ভিড়ের মধ্যে একদম চুপ করে থাকেন।

সোমনাথের তবু সন্দেহ কাটলো না। ও ভুল করে বসবে হয়তো এই ভয় পেল। তাই বললে, এই একটু আগেও আপনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

নন্দিতা হেসে ফেললো। বললে, এটা আমার একটা রোগ। অথচ আমি তখন, বিশ্বাস করুন, সত্যিই কিছু ভাবি না।

একটু থেমে ঠোঁট টিপে হাসলো।—বেশ তো আছি, কারো জন্যে ভাবি না, আমার জন্যেও কেউ ভাবে না।

সোমনাথ নন্দিতার চোখে চোখ রেখে কিছু বুঝে ফেলার চেষ্টা করলো।

নন্দিতা বললে, আপনার সব আনন্দ আজ আমিই বোধহয় মাটি করে দিলাম।

সোমনাথ বললে, আমি আনন্দের আশা নিয়ে তো আসিনি। কিন্তু আপনার নিশ্চয় একটুও ভাল লাগছে না।

—আপনার?

সোমনাথ হাসলো। বললে, আমি অল্প পুঁজির মানুষ, অল্পেই সন্তুষ্ট। আমার এটুকুই ভীষণ ভাল লাগছে।

নন্দিতার কি যে হলো কে জানে, ও চোখ নামিয়ে গাঢ় গলায় বললে, যারা

কেবল মুখের কথা শুনতে চায় তারা ভীষণ বোকা।

সোমনাথ হেসে ফেলে বললে, আপনার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বোধহয় কিছু কিছু মিল আছে।

নন্দিতা চাপা গলায় বললে, ছাই মিল। বলেই ও খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, সব মিথ্যে সব মিথ্যে।

সোমনাথের মন হঠাৎ একটা ফাটা হাউই হয়ে গেল।

বললে, আজ পিকনিকে আসার আগে ভাবতেই পারিনি এই দিনটা চিরকালের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নন্দিতা হাসলো।—আপনাদের চিরকাল তো এক সপ্তাহ বা এক মাস।

সোমনাথ চুপ করে গিয়ে ওর অভিমান বোঝাতে চাইলো।

সোমনাথ হঠাৎ বললে, আবার আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে!

নন্দিতা হেসে বললে, এখানকার জিনিস এখানে রেখে যাওয়াই তো ভাল।

সোমনাথ চুপ করে থেকে আবার বললে, আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। বলে হাত বাড়িয়ে নন্দিতার হাতখানা ছুঁয়ে বললে, বলুন কবে!

—রাখীদের সঙ্গে দেখা হলেই তো আমার সঙ্গেও দেখা হবে। নন্দিতা হেসে বললে।

সোমনাথ বললে, ভিড়ের মধ্যে শুধু দেখা যায়, দেখা হয় না।

নন্দিতা সশব্দে হেসে উঠলো। এই মুহূর্তে ওর ইতুর মত কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।—বাঃ, এমন সুন্দর সুন্দর কথা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন! শোনাতে পারলে ইতুর মত অমন চমৎকার মেয়ে—সে-ই আপনার...

—ইতুর মত মেয়েকে আমার একটুও ভালবাসতে ইচ্ছে করে না। ওরা শুধু বন্ধু হতে পারে।

নন্দিতা হেসে বললে, আমি তো ঐ রকমই।

সোমনাথ বললে, আপনি স্নিগ্ধ, আপনার সব কিছুতেই শ্রী আছে।

নন্দিতা বললে, সেটা এই লাল পাড় শাড়িটার জন্যে। যেদিন ইতুর মত স্লীভলেস হয়ে আসবো সেদিন আর আমাকে ভাল লাগবে না।

সোমনাথ শপথের মত করে বললে, আপনাকে কোনোদিনই কোনো সময়েই আমার খারাপ লাগতে পারে না।

শুনতে ভালই লাগলো নন্দিতার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো।

ও আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। দেখলো নৌকোটা মুখ ঘুরিয়ে ঘাটে ভিড়বার চেষ্টা করছে। এখনি হয়তো ইতু-অতীশ নৌকো থেকে নেমে আসবে। ওদের নির্জনতা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।

যেন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, শেষ কথাটা এখনি না বলে নিলেই নয় এমনি ভাবে সোমনাথ বলে উঠলো, বলুন, বলুন, কবে দেখা হবে!

নন্দিতা বললে, আপনি কোথায় থাকেন?

অতীশ বললে, হস্টেলে, ল' পড়ছি। অবশ্য একটা ব্যাঙ্কে চাকরিও করি।

নন্দিতা দেখতে পেল, ইতু এক পা এগিয়ে দিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে নৌকো থেকে নামছে। তাই চাপা গলায় বললে, আমি আপনাকে ব্যাঙ্কে ফোন করবো।

সোমনাথ বললে, সেই ভাল। নম্বরটা লিখে রাখুন। একটা নম্বরেই শুধু আমাকে পাবেন।

নন্দিতা কাগজ খুঁজলো, সোমনাথ কাগজ খুঁজলো পকেট হাতড়ে। তারপর

কলমটা সোমনাথের কাছ থেকে নিয়ে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাঁ হাতের তালুতে নম্বরটা বড় বড় করে লিখে রাখলো নন্দিতা।

তারপর কলমটা ফেরত দিয়ে ফিসফিস করে বললে, আমাদের কথা কিন্তু কেউ জানবে না।

সোমনাথ সায় দিল।—এই দিনটাকে কেউ ছুঁতে পাবে না। এই দিনটা শুধু আমাদের কাছেই লুকোনো থাকবে।

বললো, কিন্তু ওর কেবল ভয় হতে লাগলো হাতের তালুতে লেখা ফোন নম্বরটা নন্দিতা না মুছে ফেলে। মনে মনে ভাবলো, নন্দিতা নিশ্চয় গাড়িতে উঠেই ওর ব্যাগের মধ্যে কোনো কাগজে লিখে রাখবে।

—সে কি রে, তোরা এখনো এখানে! ইতুর গলা শোনা গেল। নৌকো থেকে নেমে বালির চড়াই বেয়ে ও তখন উঠে আসছে।

অতীশ বললে, আমরা ভেবেছিলাম তোদের খুঁজেই পাব না।

নন্দিতা হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।—তোদের কি কাণ্ড বল তো, নিশ্চয় অনেক রাত হয়ে গেছে।

ইতু তার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখলো। তারপর চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ!

অতীশ বললে, রাখীরা কোথায়?

বালির ওপর ওরা দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করলো। এতক্ষণ ওদের সময় থেমে ছিল, এক লহমায় সমস্ত ব্যস্ততা যেন হুড়মুড় করে ওদের মাথার ওপর নেমে এল।

হাঁটতে হাঁটতে ওদের চারজনের চোখ দীপক-রাখীকে খুঁজলো।

ইতু চিৎকার করে ডাকলো, রাখী! রাখী!

কে যেন সাড়া দিল ব্রীজের ছায়ায় ভেজা অন্ধকার থেকে। অন্ধকারের গহ্বর থেকে ওরা উঠে এল। দূর থেকে দীপকের লম্বা শরীরটাকেও খুব ছোট্ট দেখালো।

ওরা তাড়াতাড়ি সবুজ দ্বীপটার দিকে পা বাড়ালো। এখন জ্যোৎস্না মেখে আকাশ নদী গাছ, সবুজ সবুজ ঘাস সবই হালকা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের একটা নরম ছবি হয়ে গেছে। হঠাৎ বদলে গেছে বিকেলের সেই চেনা জায়গাটা। সেই ছোট্ট সবুজ এখন একটা বিশাল প্রান্তর। দিনের আলোর সেই কঠিন ইস্পাতের ব্রীজ এখন কালো তুলির নরম টান। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কালো কালো একটানা ঘাসের ওপর ছোপছোপ জ্যোৎস্নার পাপড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

দ্রুত পায়ে ফিরতে ফিরতে অতীশ বললে, ফ্যামিলি গ্রুপটা কখন চলে গেছে।

ইতু বললে, কেন, ঢিলে কুর্তার জন্য মন কেমন করছে?

নন্দিতা কিছু বললো না। ওর শুধু ভয় করতে লাগলো। ও একটু আগেও দেখেছিল, হাইওয়ে থেকে নীচে নামার সরু রাস্তার বাঁকে হোগলা ছাউনীর কোন একটা দোকানে টিমটিম আলো জ্বলছিল। এখন সেটাও নিভে গেছে। শুধু মাঠের মধ্যে সাদা গাড়িটা ফুটফুট করছে আলোয়।

রাখী আর দীপকরা ওদের কাছাকাছি এসে পড়লো।

রাখী বললে, ইতু, আজ নির্ঘাত জবাই হয়ে যাব বাড়ি ফিরে।

নন্দিতা অনুনয়ের স্বরে বললে, একটু তাড়াতাড়ি চলুন দীপকদা!

ইতু বললে, একটু স্পীডে চালাবেন, তা হলেই ঠিক পেঁছে যাব।

দীপক চাবির রিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঠাট্টার সুরে বললে, আমি তো ভাবছি, এই রাতটা এখানেই কাটিয়ে গেলে কেমন হয়! শুধু ভয়, আর ভয়।

ইতু বললে, বাঃ রে বাঃ, সাহস তো আমাদেরই।

রাখী নন্দিতার সে-কথাই মনে হলো। ছেলেরা কিচ্ছু বোঝে না। ওরা মনে

করে, আমরা কেবল ভয় পাই, রাখী ভাবলো। বাধা-নিষেধের গণ্ডী থেকে ওরাই তো সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারে। ভাবলো একবার বলে দীপককে, নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই, কথা বলতে নিষেধ করেছিলে কেন ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে। না চেনার ভান করে সরে গিয়েছিলে কেন? সঙ্গে তোমার মা ছিলেন, এই তো। খুব সাহসী তুমি, খুব সাহসী।

কিন্তু এখন সে-কথা বলতে ইচ্ছে করলো না।

কারণ, রাখী জানে দীপকের মন ভাল নেই। অথচ রাখী আজ ধরা দিতে চেয়েছিল, ওর মন ডুবে গিয়েছিল স্নিগ্ধ একটা ঘোরের মধ্যে। দীপক ওর বুকে-মুখে স্বীকৃতির স্বাক্ষর এঁকে দিতে চেয়েছিল। অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল রাখী নিজেও। ঠিক সেই মুহূর্তে ভিখিরি ছেলেটা অন্ধকারে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাধা পেয়ে দীপক বোধহয় ভীষণ রেগে গিয়েছিল। দীপক রুদ্ধ গলায় বলে বসলো, যা, যা। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ও তাকে তাড়াতে চাইলো। ছেলেটা তবু ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে রইলো। দীপক বললে, এক থাপ্পড় লাগাবো। যা শিগ্‌গির। ছেলেটার কি সাহস, বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, দিয়েই দেখুন না।

দীপক হঠাৎ রেগে গেল, চিৎকার করে বললে, চল তোকে পুলিশে দেবো।

ছেলেটা ভয় পেল, তবু পালালো না, ধীরে ধীরে বললে, পুলিশ আপনাদেরই ধরবে। বলেই ছুটে পালালো। সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে গেল রাখীর, দীপকের। ওরা আর স্বাভাবিক হতে পারলো না। এখন দীপকের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাসি পাচ্ছিল।

অতীশ সিগারেট ধরালো একটা।

ইতু বললে, দিন না মশাই, একটা তো কেড়ে নিয়েছিলেন তখন। জোর করে একটা সিগারেট নিয়ে নিল ইতু। ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

রাখী এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে উঠে বললে, অবাক করলি ইতু। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম, কাশতে কাশতে প্রাণ যায় আর কি।

ইতু বললে, স্কুলে একবার, মনে নেই? থিয়েটার করতে গিয়ে ব্যারিস্টার সেজে-ছিলাম, স্টেজে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেয়েছিলাম, বাবা চোখ গোল গোল করে দেখছিল।

সবাই হেসে উঠলো।

ইতু আড়চোখে একবার অতীশের মুখের দিকে তাকালো। নৌকোয় একবার চেয়েছিল ও। অতীশ দেয়নি। ফিসফিস করে বলেছিল, মাঝিটা কি ভাববে! খারাপ, খারাপ, ভীষণ খারাপ মেয়ে ভাববে ইতুকে, অতীশের সেটাই যেন আসল ভয়। ইতু জানে, অতীশের আসল ভয়, তা হলে অতীশের নিজেরই দাম কমে যাবে।

দীপক পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি। অথচ শরীরে কোথাও এতটুকু বাড়তি ভাব নেই, দিব্যি ছিপছিপে। আর তেমনি স্মার্ট। রাখী সে-তুলনায় হয়তো বা একটু বেঁটে। একদিন ইতু-নন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা গড়ের মাঠে বেড়াতে এসেছিল, রাখী আর দীপক। পুলিশ আউটপোস্টের কাছে ঘাসের ওপর গাড়ি তুলে দিয়ে ওরা নেমে পড়েছিল। ইতু নন্দিতা নামেনি। ইতু বলেছিল, তোরা তো এখন কানে কানে মন্ত্র পড়বি কিংবা ঘাস চিবোবি। তোরা যা, আমরা আছি।

সেদিন রাখী আর দীপককে দূরে দূরে হেঁটে বেড়াতে দেখে খুব সুন্দর লেগেছিল ইতুর। রাখীর কাঁধের ওপর দিয়ে তার বুকের সামনে নেমে এসেছে দীপকের বাঁ হাত, আর রাখী ডান হাতে সেটাকে মুঠো করে ধরে খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। ইতু সেদিন হেসে উঠে বলেছিল, দ্যাখ দ্যাখ, ছোট হাতের টি-এর পাশে আই! রাখীকে একদিন দীপকের সামনে লিখেও দেখিয়েছিল। বলেছিল, এই দ্যাখ টি—মানে দীপকদা, পাঁচ ফুট নয়, এই মাথা কাটলাম, মানে হাতটা তোর কাঁধে...দীপক তখন হা হা করে হেসে উঠেছে। তারপর একটা আই লিখেছে ও টি-এর পাশে, মাথায় ফুটকি দিয়ে বলেছে, এটা তোর খোঁপা। রাখী রেগে গিয়ে বলেছিল, আমি ওর পাশে এমনি বেঁটে নাকি? তা অবশ্য নয়, তবু ওরা ইতুকে 'লম্বিতা' বলে ঠাট্টা করতো বলেই ইতু সুযোগ পেলেই রাখীকে বেঁটে বলতো। রাখী শেষ অবধি বলতো, তা নয়, বরং বল দীপকের বেশ ম্যানলি চেহারা।

চাবির রিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে দীপক যখন গাড়ির কাছে গেল, তখন ওকে আরো ম্যানলি লাগলো। যত দেরিই হয়ে থাক, রাখীর মনে হলো, এই মানুষটার ওপর নির্ভর করা যায়। ইতু নন্দিতারও মনে হলো, দীপক যখন আছে তখন ঠিক সময়মত বাড়ি পেঁছে যাবো।

ওদের সকলেরই মন ভরে ছিল। সমস্ত দিনের হৈ-হুল্লোড় আনন্দ, তার পরেও হঠাৎ কিছু পেয়ে যাওয়ার, খুঁজে পাওবার পরিতৃপ্তিতে সব ক'টা মুখই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিছুটা বা তৃপ্তিতে ক্লান্ত।

আর চাবির রিংটা যেভাবে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দীপক দরজার কাছে এগিয়ে গেল, যেন বলতে চাইলো, এই চাবিটাই আজকের এই পিকনিকের আনন্দের, আজকের এই তৃপ্তির ঘরের চাবি।

দরজা খুলে স্টিয়ারিঙের সামনে গিয়ে বসলো দীপক। হাত বাড়িয়ে ওদিকের দরজার লক খুলে দিলো। রাখী এবার নিজের থেকেই গিয়ে বসলো দীপকের পাশে। তার পাশে ইতু।

দীপক আড় চোখে চেয়ে নিয়ে হেসে উঠলো। বললে, অতীশ তুইও সামনে চলে আয়।

ইতু কোনো কথা বললো না, রাখীকে চুপিচুপি একটা চিমটি কাটলো। আর নন্দিতা সোমনাথ পিছনে বসে পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করে ঠোঁট টিপে হাসলো। তারপর নন্দিতা বললে, সামনে তিনজন পিছনে তিনজনই তো ভাল হতো।

ইতু হেসে উঠে বললে, ভাগের অঙ্ক তুই ভালই জানিস দেখছি। কিন্তু জীবনটা শুধু ভাগ নয়, বুঝলি।

সোমনাথ হাসলো। বোধহয় নন্দিতার পক্ষ নেবার জন্যেই বললো, পিকনিকটা

কি জীবন নাকি?

রাখী উত্তর দিলো। হেসে বললে, জীবনটাই তো একটা পিকনিক। পিকনিকের মত করে নিতে জানলেই হয়। রাখীর কথার মধ্যে তার উচ্ছল আনন্দটুকু প্রকাশ হয়ে পড়লো।

ইতুর হাতে তখনো সিগারেটটা জ্বলছে। আসলে ও সিগারেটটা নষ্ট করছিল। হুস্ হুস্ করে টানছিল হুস্‌হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছিল অতীশের চুলে। একবার দীপকের মুখের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললে, চটপট মশাই, চটপট। এর পর আর বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।

দীপক কোন কথা বললো না। ওর মন ভারী হয়ে ছিল। সেই ভিখিরি ছেলেটা কোথাও আছে কিনা দেখলো। তারপর কাচ নামালো গাড়ির।

ওরা কেউই বুঝতে পারেনি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাখী দীপকের মুখের দিকে তাকালো। দীপক কোন কথা বললো না।

—কি হ'লো? রাখী হঠাৎ বলে উঠলো।

অতীশ বোধহয় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করার জন্যে আবার খুললো। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলো ভিতরে। আর অতীশ দীপকের মুখের দিকে তাকালো। দীপকের মুখ তখন সেকেন্ডে সেকেন্ডে বদলে যাচ্ছে। ক্রমাগত স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছে দীপক, স্টার্ট নিচ্ছে না। দেখতে দেখতে দীপকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কপালে ঘাম জমতে শুরু হলো ওর। একটা প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ পড়লো দীপকের মুখে।

—স্টার্ট নিচ্ছে না রে অতীশ। একটা বিধ্বস্ত মানুষের গলায় দীপক বলে উঠলো। দীপককে এতখানি অসহায় ওরা কখনো দেখেনি।

স্টার্ট নিচ্ছে না। একটি মাত্র কথা। ছ'টি মানুষ এতক্ষণ একটি আনন্দের ফোয়ারা হয়ে উঠেছিল। একটি মাত্র কথায় তারা পরস্পর থেকে ছিটকে সরে গিয়ে ছ'টি পৃথক মানুষ হ'য়ে গেল। ছ'ছটি ব্যক্তিগত সমস্যা, ছ'ছটি স্বার্থ।

রাখী প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। ও ভেবেছিল, ঠাট্টা।

রাখী হতাশ ভাবে বলে উঠলো, তা হলে কি হবে?

রাখী ঘড়ি দেখলো, ইতু ঘড়ি দেখলো। নন্দিতা সোমনাথের মুখের দিকে তাকালো।

বিভ্রান্ত গলায় দীপক বলে উঠলো, কি করা যায় বল তো অতীশ।

অতীশের মন তখনো তৃপ্তিতে টইটম্বুর, ব্যাপারটার গুরুত্ব তখনো ও বুঝে উঠতে পারেনি।

ও হেসে উঠে বললে, কি আর করবি, বনেট খুলে ফেল। দেখেছি গাড়ি খারাপ হলেই সকলে বনেট খুলে ফেলে।

ইতু স্তম্ভিত হয়ে গেল অতীশের রসিকতায়।

দীপক গম্ভীর গলায় বললে, না রে. হাসি নয়।

তিন তিনটি সুখী প্রেম মুহূর্তে অশুভ আতঙ্ক হয়ে গেল।

সত্যি সত্যি নেমে পড়ে দীপক বনেট খুললো। রাখী ইতু নন্দিতারা তখনো আশায় আশায় বসে রইলো। ঘন ঘন ঘড়ি দেখলো।

অতীশ বললে, তোকে তখনি বলেছিলাম. মেকানিজম শিখে নে।

দীপকের সমস্ত মন তখন একটা ক্ষ্যাপা কুকুর। অতীশের কথায় ও ভিতরে ভিতরে রেগে গেল। কিন্তু কোন কথা বললো না। মেকানিজম্ শিখে নে! যেন ষোল-আনা মোটর মেকানিক না হয়ে গাড়ি চালানো যাবে না। ওর মনে হলো

রাখীর সামনে, ইতু নন্দিতার সামনে অতীশ ওকে ভীষণ ছোট করে দিল। রাখীর সামনে সেই ভিখিরি ছেলেটার কথায় ও যেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল।

বনেট খুলে আধো আলো আধো অন্ধকারে সেই জটীল যন্ত্রপাতির মধ্যে অসহায়ের মত উঁকি দিলো দীপক। ব্যাটারির কানেকশন দেখলো, ডিস্ট্রিবিউটরের প্লাগগুলো ঠেলে দিলো। ফিরে এসে আবার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো।

—বোধহয় কার্বোরেটরে গোলমাল। নিজের মনেই বললো দীপক।

রাখী তখন কিছু দেখছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ভয়ে ভাবনায় ওর তখন চোখ ঠেলে জল আসছে। বাড়ি, বাড়ি, সমস্ত মন জুড়ে ওর তখন একটাই ভাবনা। বাড়ি ফিরতে হবে।

রাখী হঠাৎ কান্নার গলায় বলে উঠলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিব্রত দীপক দুটো ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে রাখীর দিকে তাকালো, কোন কথা বললো না।

অতীশ বললে, আমরা ঠেলে দিই বরং।

সেই ভাল। দীপক গিয়ে স্টিয়ারিঙে বসলো। ক্লাচ টিপে বসে রইলো গীয়ার টেনে। রাখী ইতু নন্দিতা অতীশ সোমনাথ—সকলে মিলে প্রাণপণে ঠেলতে লাগলো গাড়িটা। আর মাঝে মাঝে ক্লাচ ছেড়ে স্টার্ট নেবার চেষ্টা করলো দীপক। একবার যেন স্টার্ট নেবার মত শব্দ হলো, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

যেটুকু আশা দেখা দিয়েছিল আবার দপ্ করে তা নিভে গেল। দীপকের মনে হলো গাড়িখানা যেন জগদ্দল পাথরের মত তার মাথার ওপর চেপে বসেছে। গাড়িটা ঠেলে হাইওয়েতে তুলতে পারলেও হয়তো কারো সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু অতখানি চড়াই ঠেলে তোলাও যাবে না।

সকলেই চুপ করে ছিল, কেউ কোন কথা বলছিল না। শুধু রাখী ইতু নন্দিতা পরস্পরের সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে সান্ত্বনা খুঁজলো। কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারলো না।

ভেঙেপড়া মানুষের মত দীপক গাড়ির ওপর এক হাত রেখে মাথা নোয়ালো। একটা মুষড়ে পড়া হতাশ মানুষের মত তুচ্ছ লাগলো ওকে।

বিভ্রান্তভাবে ও শুধু বললে, একটা মেকানিক পেলে হতো।

অতীশ বললে, চল্ সোমনাথ, ব্রীজের ওদিকে কোথাও যদি...

অতীশ আর সোমনাথ ব্রীজের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই নন্দিতা বললে, আমার বড় ভয় করছে রাখী।

রাখীর নিজেরও ভয় করতে লাগলো। দীপক একা, আর ওরা তিনজন—এই অন্ধকারে নির্জনে। এখন আর দীপকের ওপর নির্ভর করতে পারছে না রাখী। রাখীর মনে হলো দীপক ভীষণ স্বার্থপর, ও কেন বলছে না, 'তোমরাও ওদের সঙ্গে যাও'। ওদিকে তবু লোকজন চলাচল করছে। আলো আছে।

রাখী নিজেই হঠাৎ বলে উঠলো, আমিও ওদের সঙ্গে যাই।

ইতু বললে, আমিও।

নন্দিতা বললে, আমিও।

দীপকের হঠাৎ মনে হলো এরা সকলেই যেন ওকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পালাতে চাইছে। এমন কি রাখীও।

অতীশ একবার ভাবলে সোমনাথকে বলে, তুই থাক্। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ভয় হলো, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রে ও একা, সঙ্গে তিনটি মেয়ে...

—না না, আপনাদের একজনকেও আসতে হবে না। প্রায় আদেশের সুরে অতীশ বললে।

ইতু মনে মনে বললে, স্টুপিড।

নন্দিতা আবার বললে, আমার ভীষণ ভয় করছে অতীশদা।

অতীশ আর সোমনাথ কোন কথা বললো না, দ্রুত পায়ে ওরা হাইওয়ের দিকে, ব্রীজটার দিকে এগিয়ে গেল।

রাখী ইতু নন্দিতা ধীরে ধীরে গাড়িটার কাছ থেকে দীপকের কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসে ব্রীজটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওদের মনে হলো অতীশ আর সোমনাথ অত্যন্ত ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। ওরা দৌড়চ্ছে না কেন? ওরা ছুটে গিয়ে একজন মেকানিক ডেকে আনছে না কেন?

রাখী ফিসফিস করে বললে, ইতু, কি করি বল তো?

নন্দিতা বললে, নিশ্চয় কোন বাসটাস পাওয়া যায়।

ইতু বললে, এর পর বাড়ি ফিরলে সাংঘাতিক কিছু ভেবে নেবে।

বইয়ের ভাষায় যাকে বলে মনোরম, দিনের বেলায় জায়গাটা ছিল তাই। সবুজ ঘাস, লাল টগর, নদীর ওপর নৌকো। রাত্রে চাঁদের আলোয় সুন্দর, আরো সুন্দর। অথচ এখন আর কেউই সেসব দেখছে না, কারো সেদিকে চোখ নেই।

রাখী যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ইতুদের কাছে জায়গাটার বর্ণনা দিয়েছিল, ইতু ওর পিঠে প্যাট করার মত মৃদু চাপড় মেরে বলেছিল, থাম্ থাম্, সব সুন্দর আসলে চোখে। তোর চোখ এখন সবকিছুই সুন্দর দেখবে।

রাখীর হঠাৎ এক ঝলকে সেই কথাটা মনে পড়লো। এখন এই পিকনিকের মাঠ ওর কাছে অসহ্য লাগছে। এই সবুজ দ্বীপ সত্যি সত্যি দ্বীপ, এখান থেকে উদ্ধার পেলেই বাঁচে। আর এত যে জ্যোৎস্না উপছে পড়ছে, ঠান্ডা হাওয়া, অথচ রাখীর সারা শরীর চিড়বিড় করছে। রাখীর নিজেরই মনে হলো ও বোধহয় ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছে। এখন আর কোন কিছু দেখার চোখ নেই ওর।

একদৃষ্টে ব্রীজের দিকে তাকিয়ে আছে রাখী। কখন অতীশ আর সোমনাথকে দেখা যায়। কখন তাদের সঙ্গে কালিঝুলি মাখা কোন মেকানিকের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। তার চেয়ে আনন্দের দৃশ্য এখন আর কিছু নেই।

দীপক চুপচাপ বনেটের ওপর বসে আছে। সিগারেট টানছে একমনে। যেন মোটরকারটাই সব, আর কারো বিষয়ে কিছু চিন্তা করার নেই।

এখানে একটু দূরে ওরা তিনজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবনায় ভয়ে কারো মুখে কথা নেই। শুধু থেকে থেকেই রাখী ঘড়ি দেখছে, ইতু ঘড়ি দেখছে। এর পর মিস্ত্রী পেলেও ওরা কখন পেৌছবে কে জানে। অথচ দীপককে সে-কথা বলতেও সাহস হচ্ছে না।

ইতু ধীরে ধীরে বললে, একটা বাস-টাস পাওয়া যায় কিনা দেখলে হতো!

একথা রাখীর আগেই মনে হয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে দীপককে বলতে পারেনি। দীপক হয়তো ভাববে রাখী স্বার্থপর। এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন দীপককেই মনে হচেছ—মনে হচ্ছে ঐ গাড়িটার জন্যে ওর যতখানি দুশ্চিন্তা, তার কানাকড়িও নেই রাখীর জন্যে। ও নিজে থেকেই কেন একথা ভাবছে না।

—অতীশ ফিরলে তুই বলিস ইতু। না, না, আমিই বলবো। রাখী চাপা গলায় বললে।

আর ইতু নার্ভাস হাসি হাসলো।—এরপর বাড়ি ফিরলে স্রেফ কিমা করে দেবে। কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে ভাই। ইতু আবার হেসে উঠলো, কিন্তু এটা ঠিক হাসি নয়।

তারপর একটু থেমে বললে, এখানেও হতে হবে হয়তো, গুন্ডাদের হাতে পড়ে।

নন্দিতা বললে, আমার ভীষণ ভয় করছে রে।

সকাল বেলাকার ঘটনা মনে পড়ে রাখীর আরো ভয় হলো। ভাবলে, মা পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া না করলেই হতো। 'তোকে দেখতে আসবে।' পিসীমার গলার স্বরটাও কেমন পুরুষালি। একটুও মিষ্টি করে কথা বলতে পারে না।

রাগের মাথায় একদিন ইতুকেও বলে ফেলেছিল।—এই পিসীমাটা ভাই কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যদ্দিন থাকবে, না জ্বালিয়ে ছাড়বে না।

পিসীমাকে নিয়ে ওর আর এক সঙ্কোচ। কোন রুচি নেই পোশাকে-আশাকে, কথা বলে কাটা কাটা। কাকে কখন কি বলে বসে সেই এক ভয়। কলেজের মেয়েরা

কেউ হঠাৎ ওকে ডাকতে এলে তাদের বাড়িতে এনে বসাতে ইচ্ছে করে না। পাছে পিসীমাকে দেখে ফেলে। পিসীমাকে বিশ্বাসও নেই, হয়তো রাখীকে যেসব কথা বলে, ওর ব্লাউজের ছাঁট নিয়ে, ওর শাড়ি পরার ধরন দেখে, হয়তো বন্ধুদেরও তেমনি কিছু বলে বসবে। রাখীর সবচেয়ে ভয় কলেজের মেয়েরা হয়তো সেজন্যে রাখীকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এমনিতেই তো ওরা রাখীর ওপর হিংসেয় জ্বলে। নিরঞ্জনকে জড়িয়ে অপবাদ ছড়াতেও ছাড়েনি।

ইতু হঠাৎ বললে, আমার কি ভয় হচ্ছে জানিস? বাড়িতে হয়তো থানাপুলিশ করে বসবে, হাসপাতালে খুঁজবে। ভাববে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

ভয় থেকে রাখীর শেষ অবধি বাড়ির ওপরই রাগ হতে লাগলো। ও বললে, তুই আদুরি, তোর কথা অন্য। আমার জন্যে তাও ভাববে না।

বাড়ির ওপর ঐ এক অভিমান রাখীর। দাদা কিংবা ছোট ভাইটা দেরী করে ফিরলে মার ভাবনা, কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। ফিরে এলেই মা নিশ্চিন্ত, তখন মা'র ধমক যেন পিঠে হাত বোলানো। আর রাখী দেরী করলেই সক্কলের এক সন্দেহ। মেয়ে নিশ্চয় অন্যায় করছে, খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় কোন বাজে ছেলের পাল্লায় পড়েছে। রাখীর নিজের যেন কোনই বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। অথচ ও জানে, মা নিজেই বোকা। একবার তো রেগে গিয়ে আরেকটু হলে বলেই ফেলতো। সে-কথা মনে পড়লে ওর এখন হাসি পায়।

ইতুকে বড় হয়ে বলেছিল, সে কি ভয়, কি ভয়। বলতে গিয়ে হেসে লুটোপুটি।

মণ্টুমামা বলতো তাঁকে, মা ভাবতো খুব ভাল লোক। রাখীর তখন কতই বা বয়েস—ষোলো সতেরো। মা'র চোখের সামনেই ওকে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিতো। খুব আহ্লাদী আহ্লাদী কথা বলতো। কিন্তু রাখীর বেশ মনে আছে, কণ্ঠার ওপর তিনটে আঙুল একদিন স্থির থেকেও এমন সব কথা বলতে চেয়েছিল যে, রাখীর সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। ও ভীষণ ভয় করতো, ও ভিতরে ভিতরে লজ্জায় মরে যেত, অথচ কিছু বলতে পারতো না। পাছে মা বুঝতে পারে— সে যেন ওরই লজ্জা। তারপর বড় হয়ে একদিন এক ঝটকায় হাতটা নামিয়ে দিয়েছিল। মণ্টুমামা আর বেশী সাহস পায়নি।

ইতু শুনে খুব হেসেছিল। বলেছিল, আমার তো গুনে শেষ করা যাবে না। সব এক রে, সব এক। অথচ বাবা-মার যত ভয়, বাইরে কোথাও প্রেম করছি কি না।

বাড়ির ওপর রাগ সেজন্যেই আরো বেশী হয়। কিন্তু এখন আর রাগ নয়, জ্বালা নয়, এখন শুধু ভয়।

নন্দিতা ধীরে ধীরে বললে, ফিরছে না কেন বল তো!

ইতু হাসবার চেষ্টা করে বললে, বোধহয় অগস্ত্য-যাত্রা।

রাখী কিছু বললো না। ও শুধু বাড়ির দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো। 'কেন আবার, তোকে দেখতে আসবে।' পিসীমার কথাটা মনে পড়তেই রাখীর মনে হলো, সমস্ত বাড়িটা এখন নিশ্চয় থমথম করছে। ফিরে গেলে হয়তো একটা কথাও বলবে না কেউ। কাল হয়তো চোখের জল মুছতে মুছতে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে হবে। রাখী ভেবে রেখেছিল রাগারাগি করে, কোন একটা খুঁত বের করে বলে বসবে, ওখানে আমি বিয়ে করবো না। কিন্তু এখন আর সে-উপায়ও রইলো না। আজকের এই দেরী করে বাড়ি ফেরাই হয়তো কাল হলো। মেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ হাতে হাতে।

অথচ সবকিছুর জন্যে দীপক দায়ী। ও বলে ফেললো, একটা ভাঙা গাড়ি এনে কি বিপদেই না ফেললে।

চোখের সামনে সেই নতুন ফিয়েটখানা ভেসে উঠলো। ফ্যামিলি গ্রুপের সেই গাড়িখানাও তো দিব্যি চলে গেছে।

ইতু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো।—ও বেচারীর কি দোষ বল্। গাড়িটা তো আর সত্যি ভাঙা নয়। একটু পুরোনো মডেল, এই যা।

রাখী এখন আর দীপকের হয়ে কারো ওকালতিও সহ্য করতে পারছে না। ও চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে, স্বার্থপর, স্বার্থপর। কেন, ও আমাদের কথা ভাবতে পারতো না? গাড়িটা ফেলে রেখে বাসটাস পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে যেতে পারতো না? মেকানিক, মেকানিক খোঁজো। শেষের কথাটা ও যেন ভেংচি কেটে বলে উঠলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতা বলে উঠলো, ঐ বোধহয় আসছে।

রাখী আর ইতু ব্রীজের দিকে তাকালো ঝট্ করে। একটা মাল বোঝাই লরী গুম্ গুম্ আওয়াজ তুলে ব্রীজ পার হচ্ছে। আর পিছনে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে দুটি মানুষ। ওরা ভাল করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। জ্যোৎস্নায় ভিজে ব্রীজটাকে একটু আগেও কত সুন্দর লাগছিল। এখন নির্জন শূন্যতা। হ্যাঁ, বোধহয় অতীশ আর সোমনাথ। ওরা দুটি প্রাণী ব্রিজের শূন্যতাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইতু বললে, মেকানিক পায়নি।

যেটুকু আশা ছিল, তাও যেন ফুঁ দিয়ে কে নিভিয়ে দিল।

রাখী বলে উঠলো, কি হবে বল তো ইতু!

মনে হলো নন্দিতার চোখে জল টলমল করছে।

রাখী ইতুকে টানতে টানতে দীপকের কাছে চলে গেল।—এই, ঐ দ্যাখো, মেকানিক পায়নি। তোমরা কেউ একজন চলো, বাসটাস যদি পেয়ে যাই...

দীপক ব্রীজের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ও এতক্ষণ ওদের জন্যেই অপেক্ষা করেছে। ভেবেছে, ওরা ফিরে এলেই ঠিক এই কথাটা ও নিজেই বলবে। বলবে, সোমনাথের সঙ্গে গিয়ে দ্যাখো বাস পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেই কথাটা রাখীর মুখ থেকে শুনে ওর মনে হলো ইতু নন্দিতার কাছে রাখী ওকে ছোট করে দিল। এরপর অতীশ আর সোমনাথের কাছেও ও ছোট হয়ে যাবে।

রাখীর ভালবাসা ছিল ওর গর্ব। এরপর অতীশ হয়তো ঠাট্টা করে বলবে, জানা আছে, জানা আছে, তুই আর গর্ব করিস না দীপক। তোকে ফেলে তো দিব্যি কেটে পড়লো।

অথচ দীপক নিজেই বরং মহত্ত্ব দেখানোর সুযোগ পেত। রাখী ভাবতো, কি ভাল!

রাখীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো দীপক। রূঢ় গলায় বললে, আমি তো শালা ট্যাক্সি ড্রাইভার। ব্রেক ডাউন হয়েছে, অন্য ট্যাক্সির গলা জড়িয়ে ধরে চলে যাবে, তার আবার বলার কি আছে!

অতীশের মন খুব খুশী-খুশী ছিল। তাই একটু আগেই ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা রক্ত ছড়িয়ে লাল গোলাপ ফুটিয়েছিল।

ইতুকে প্রথম যেদিন দেখেছিল দীপকদের সঙ্গে, সেদিনই ওর মনে হয়েছিল ওই বেসুরো বাঁশিটাই আমার চাই। তারও আগে একদিন রাখী বলেছিল, 'ইতুকে তো দেখেননি, দারুণ ফীগার। তবে ওকে শায়েস্তা করা অত সহজ নয়।' যেদিন আলাপ করলো, সেদিন অতীশকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি, ঠিক বলিনি?'

'হাস্য, লাস্য, অনেকখানি প্রগলভতা, আর কিছুটা শিঙ বাগানো বাছুর, রাখীকে বলেছিল অতীশ। ইতুর আড়ালে। আর দীপককে বলেছিল, 'ভিজে সাবানের মত মেয়ে, ধরতে গেলেই পিছলে যাবে।' কিন্তু তার পরও ও ইতুকে যতবার দেখেছে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠেছে।

তাই আশা ছেড়েই দিয়েছিল। শুধু সঙ্গে থাকার আনন্দটুকুই ভেবেছিল যথেষ্ট। অভিনয় শেষ অবধি সত্যি হয়ে যাবে, এত সহজে ধরা দিয়ে অতীশকে অবাক করে দেবে, ও ভাবতেই পারেনি। আরো কিছুক্ষণ, আরো কিছুক্ষণ। অতীশ চাইছিল ফেরার সময়টা আরো খানিকটা পিছিয়ে যাক্। না-হ'লে বুকের মধ্যে ফুটে ওঠা লাল গোলাপ যেন স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু তার আগেই কব্জিতে বাঁধা বড় ঘড়িটার দিকে চট্ করে তাকিয়ে নিয়ে ইতু বলে উঠেছে—সর্বনাশ। বাড়ির চাকরি বোধহয় রইলো না।

—আর একটুক্ষণ, প্লীজ। অতীশ ইতুর হাতে চাপ দিয়ে অনুরোধ করেছে।

ইতু হেসে উঠেছে।—কি ছেলেমানুষি দ্যাখো, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি, আমি তো রইলামই। কিন্তু আজ, দেখেছো ঘড়িটা? কব্জিটা তুলে দেখিয়েছে অতীশকে।

তখন নৌকোটা ঘাটে না ভিড়োতে বলে আর উপায় নেই। কিন্তু নৌকো যখন ঘাট ছুঁয়েছে তখন ইতু বলেছে, আমি যা একটা মজা করি না, কেউ ধরতে পারে না।

—কি মজা?

—যেদিনই দেরী হবার ভয় থাকে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেয়ালের ঘড়িটার কাঁটা পনেরো মিনিট পিছিয়ে রেখে আসি। বলে হেসে ফেলেছে ইতু।

অতীশও হেসেছে।—এক নম্বরের বিচ্ছু তুমি।

ইতু ওকে একটা চিমটি কেটেছে।—বিচ্ছু!

অতীশের মন তাই বেশ খুশী-খুশী ছিল। কিন্তু গাড়িটা খারাপ হয়েই ওর মেজাজও বিগড়ে গেল। না, বোধহয় শুধু সেজন্যে নয়। ওর মনে পড়লো, নৌকোতে ইতু একবার সিগারেট চেয়েছিল। অতীশ দেয়নি। মাঝি অবশ্য ওদের চেনে না, কোনদিন আর দেখাও হবে না, তবু ইতু সিগারেট খাচ্ছে দেখলে কি না কি ভেবে বসবে এই ভয়ে দেয়নি। ইতু ঠিক বুঝেছে। বলেছে, মাঝিটা খারাপ ভাববে বলে? তারপর চাপা গলায় বলেছে, আমি তো খারাপই।

সবই বোঝে ইতু, তবু পাগলামি করতে ছাড়বে না। সেই শেষ অবধি সিগারেট ধরালো দীপকদের সামনে; বেশ মজা লাগছিল সত্যি, কিন্তু যে-ভাবে হুসহুস করে ধোঁয়া ছাড়লো, যেন স্টেট বাসের একজস্ট পাইপ। সত্যি মাঝে মাঝে খায় কিনা সন্দেহ হয়েছে।

ব্রীজের ওপর দিয়ে মেকানিকের খোঁজে যেতে যেতে অতীশ হঠাৎ বললে, ইতুটা কিন্তু বেশ স্পোর্টিং, না?

সোমনাথ এড়িয়ে যাবার মত উত্তর দিলো, হুঁ।

অতীশ অবশ্য উত্তরটা শুনতেও চায়নি। ব্রীজের রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে ও হাঁটছিল। যেন ঐ রেলিঙে ইতুর ছোঁয়া লেগে আছে। আজই বিকেলে এখানে হাত ধরাধরি করে ও আর ইতু হেঁটে বেড়িয়েছে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রেলিঙে ভর দিয়ে নদী দেখেছে নৌকো দেখেছে। আর ইতু বলেছে, ওরা কি ভাবছে বলুন তো? ভাবছে ইতুটা দারুণ জমিয়েছে! বলে হেসে উঠে ইচ্ছে করে অতীশের গায়ে ঢলে পড়েছে।

সেই সব কথা মনে পড়তেই অতীশ ভাবলো, ওটা অভিনয়। আসলে অতীশ হয়তো বুঝতে পারেনি, কিন্তু ইতুর নিশ্চয় তখন থেকেই ওকে ভাল লেগেছে। তা না হ'লে অত সহজে কোন মেয়ে ধরা দেয় নাকি, অমন হঠাৎ? 'আমি তো খারাপ!' দু দুবার বলেছে ইতু, আর সেজন্যে মনের মধ্যে একটু খিচখিচ রয়েই গেছে। সত্যি বলছে কিনা কে জানে। নাঃ, সত্যি হ'লে কি আর বলতো? অতীশ নিজের মনেই হেসে ফেললো। গোলি মারো, অন্য সব মেয়েরা যেন কত ভালো।

অতীশের হঠাৎ একবার ইচ্ছে হলো, মেকানিক-টেকানিক যদি না পাওয়া যায়, বেশ হয়। আজকের রাতটা যদি ওরা আটকে পড়ে...ও যা মেয়ে, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়, ও নির্ঘাত ম্যানেজ করে নেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হলো, শেষে সবই না যায়। বাড়িটা কেমন তা তো বোঝা যাচ্ছে না, মেয়েদের যত দুঃসাহস তো সন্ধ্যে অবধি। শেষে বাড়ি থেকে বেরোনোই হয়তো বন্ধ হয়ে গেল।

ও যা ভেবেছিল তাই।

ওদের ফিরতে দেখে রাখী আর ইতু যেভাবে শুকনো মুখে এগিয়ে এলো, 'কি হলো মিস্ত্রী?' বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তাতেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে আর অসুবিধে হলো না।

নিজের জন্যেও চিন্তা হচ্ছিল অতীশের। বৌদি নিশ্চয় খাবে না। দেরী করে ফিরলে প্রায়ই তো খায় না। খাবার ঢেকে রেখে মাদুর বিছিয়ে ঘুমোয়। একদিন তো দাদাকে পাঠিয়েছিল খালসা হোটেল থেকে আপিসের বন্ধুদের ফোন করতে। আজ আবার তেমনি কাণ্ড করে একটা সীন ক্রিয়েট করে না বসে বৌদি।

—কি হবে তা হ'লে? আর কিছু ব্যবস্থা করা যায় না? একটুখানি আশা পাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলো রাখী।

পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজন মেকানিকের বাড়ি পেয়েছে ওরা। কিন্তু মিস্ত্রী কাজ থেকে ফেরেনি তখনো। তার জন্যে অপেক্ষাও করতে পারেনি। শুধু তার ছেলেকে বলে এসেছে পাঠিয়ে দিতে।

রাখী ইতু নন্দিতা তিনজনই ভিড় করে এলো, যেন তিনটি ভয় পাওয়া হাঁস পুকুর থেকে উঠে পড়েছে। অতীশ তাকিয়ে দেখলো ওদের মুখে চোখে কোথাও কোন প্রেম নেই। শুধু উৎকণ্ঠা।

ইতু বলল, চল্ চল্, দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।

অতীশের খুব মায়া হলো ইতুর মুখের দিকে তাকিয়ে। তবু বলতে হলো, লাস্ট ট্রেন এইমাত্র চলে গেছে, ফিরে এসে খবর দেয়ার আর সময় ছিল না।

ইতু হতাশায় ভেঙে পড়ে বললে, আমরা তখনই সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম।

রাখী আগুনের চোখ নিয়ে ফিরে তাকালো দীপকের দিকে। স্বার্থপর, স্বার্থপর! মনে মনে বললে।

নন্দিতার গলা ভিজে গেল।—তা হ'লে কি হবে?

বাস নেই, ট্রেন নেই। এখন একমাত্র উপায় অপেক্ষা করা। মেকানিক যদি এসে হাজির হয়। না এলে আবার একবার খোঁজ নিতে যাবে অতীশ।

দীপক অতীশ সোমনাথ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। মাঝে মাঝে ব্রীজের দিকে আশায় আশায় তাকাচ্ছে।

দীপক প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটটা ফেলে দিলো।—সিগারেটও শেষ, নিয়ে এলে পারতিস।

অতীশ বললে, চারমিনার আছে। বলে নিজেই সিগারেট বের করে ধরাতে গেল। দুটো কাঠি ছিল, হাওয়ায় নিভে গেল দুটোই। শেষে দীপকের সিগারেট থেকে ধরিয়ে নিলো। কাঠি বাঁচাতে হবে। ওর হঠাৎ মনে পড়লো, বিকেলে বসে বসে ওর দেশলাই নিয়ে ইতু একটার পর একটা কাঠি জেবলে নষ্ট করেছিল। অকারণ দেশলাই জ্বালা কি যে খেলা অতীশ বোঝে না। এখন সে-কথা মনে পড়তেই ইতুর ওপর বিরক্তি বোধ করলো।

দীপকও তিক্তবিরক্ত হয়ে ছিল। নিজের মনেই বললে, বাজে শখ সব, পিকনিক করতে যাবো!

ইতু নন্দিতা রাখী তিনজনে তখন আলাদা দল হয়ে গেছে। দীপকদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওরা তখন ফিসফিস করে নিজেদের দুশ্চিন্তা, ভয়, হতাশার কথা বলছে। দীপক কি বিচ্ছিরি, রুড। ছোটলোক, ছোটলোকের মত কথাবার্তা। ভদ্রভাবে বলা যেত না? অন্য ট্যাক্সির গলা জড়িয়ে ধরে! যেন বাড়ি ফেরা মানে অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করা। এই নোংরা সন্দেহ থেকে কিছুতেই যেন বেরিয়ে আসতে পারছে না দীপক! কলেজের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে যেদিন আলাপ করিয়েছিল কি বিচ্ছিরি গোমড়া মুখ করে বসে ছিল। রাখী মনে মনে ভাবলো, আর নয়, দীপকের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নয়। ছি ছি, ইতুদের কাছে কত গর্ব করেছে ও, বলেছে, দীপক ওর জন্যে পাগল! আর ওদের সামনেই রাখীকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিলো দীপক। দিনের আলোয় ও বোধহয় ইতুর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারবে না।

—আসছে বোধহয়, মেকানিকটাই বোধহয়।

দূর থেকে লোকটাকে ব্রীজের ওপর দেখতে পেয়ে দীপক নিজেই রাস্তার দিকে ছুটে গেল। পিছনে পিছনে অতীশ।

নন্দিতা সব সময়েই একটা কমপ্লেক্স থেকে ভুগছে। রাখী ইতু ওর বন্ধু ঠিকই, নন্দিতার সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ কোনো পার্থক্য করে না। তবু নন্দিতার নিজের মনে হয় ও যেন ওদের সমান সমান নয়। শুধু যে আর্থিক স্বচ্ছলতায় রাখীদের সমান নয় বলেই ও সবকথা মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না, তাও নয়। আসলে রাখী-ইতুদের বাড়ির পরিবেশ ওদের তুলনায় অনেক বেশী মডার্ন। ওদের মা-বাবারা যেসব ব্যাপারে কোনো দোষ দেখে না, কিংবা যে-সব রসিকতা ওরা বাড়িতে বসে করতে পারে, সে-সব কথা শুনতেও ভয় পায়। ইতু তো একদিন তার মাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে গল্প করে বলেছিল কোন্ হ্যান্ডসাম ছেলে ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে কি করেছে। নন্দিতা ছিল সেদিন। ও দেখেশুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আবার ইতুর মাকে হাসতে দেখে আরো অবাক হয়েছিল। আচারব্যবহারে একটু গোঁড়া হওয়া যে এতখানি লজ্জার নন্দিতা যখন ছোট ছিল তখন জানতোই না। ইতুর মত মেয়েদের ও নিজেই তখন অপবাদ দিতো। এখন ওদের সামনে গুটিয়ে-সুটিয়ে থাকে।

কাঁধে একটা যন্ত্রপাতির থলে আর দু-ফালি তার লাগানো একটা বড় বাল্ব নিয়ে অতীশ আর দীপকের পিছনে পিছনে মিস্ত্রীটা এলো। আসতে আসতে দীপক মিস্ত্রীটার সঙ্গে তোয়াজ করার ভংগীতে কথা বলছিল।

নন্দিতা রাখী আর ইতুর মুখের দিকে তাকালো। দেখে মনে হলো রাখী মিস্ত্রীটার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন ও লোকটাই এখন হীরো হয়ে উঠেছে। সারাটা দিন নির্ভর করে ছিল দীপকের ওপর। এখন দীপকের দিকে ওরা কেউই তাকাচ্ছে না। সকলের চোখ মিস্ত্রীটার মুখের দিকে। দীপকের গাড়ির চাবিটা এখন আর সেই আশ্চর্য যাদুদন্ড নয়, মিস্ত্রীর থলের মধ্যেই সব আশাভরসা।

কিন্তু ঐ লোকটা কখন গাড়ি সারাবে, তারপর গাড়ি স্টার্ট নেবে, ওরা বাড়ি পৌঁছবে, ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো নন্দিতার। ও যে আছে, ওর ভাবনা যে রাখী ইতুর চেয়ে অনেক বেশী তা কেউ ভাবছেই না।

সোমনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর মাঝেমাঝেই সমবেদনার চোখে তাকাচ্ছে নন্দিতার দিকে। ওকে নন্দিতার বেশ ভাল লেগেছিল, মানুষটা অতীশের মত কথার ফুলকি নয় বলে। রীতিমত ভদ্র, ঠান্ডা, কেমন একটা সৌম্য ভাব আছে বলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওর মনটাও খুব নরম।

নন্দিতা তবু ফিসফিস করে বললে সোমনাথকে, সারাতে কতক্ষণ লাগবে?

সোমনাথ হতাশভাবে হাত ঘোরালো, কি জানি।

নন্দিতা রাখীকে কানে কানে বললে, এর পর বাড়ি গিয়ে কি বলবো বল তো?

সোমনাথ হঠাৎ বললে, রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লরী তো যাচ্ছে, লিফট্ চাইলে দেবে না?

ইতু এত দুর্ভাবনার মধ্যেও হেসে ফেললে।—না বাবা, একেবারে লিফ্‌ট্ করে নিয়ে চলে যেতেও তো পারে।

ওরা তিনজনই হাসলো, কিন্তু সে-হাসি যেন কান্নার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

হেসে ফেলেও ইতুর ওপর রাগ হলো নন্দিতার। এ সময়ে হাসাও তো অপরাধ।

সোমনাথ আবার নন্দিতাকে বললে, অতীশের সঙ্গে আপনারা একজন কি দু'জন চলে যান না। আমি বরং থেকে যাই।

নন্দিতা অনেকখানি আশা পেল, সোমনাথকে ভাল লাগলো।

মিস্ত্রীটা ততক্ষণে বনেট খুলে ফেলেছে। ব্যাটারীর সঙ্গে তার দুটো লাগাতেই বাল্‌ব্‌ জ্বলে উঠলো। আর দীপক অতীশ সোমনাথ গিয়ে ভিড় করলো বনেটের সামনে, মিস্ত্রীর আশপাশ থেকে ইঞ্জিনের ওপর উঁকি মারলো।

সোমনাথকেও উঁকি মারতে দেখে নন্দিতাও ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। রাখী ইতুও।

মিস্ত্রী তখন কি-সব খোলাখুলি করছে, পরীক্ষা করছে। আর দীপক স্টিয়ারিঙে এসে বসেছে। মিস্ত্রীর কথায় এক একবার স্টার্ট দিচ্ছে।

অতীশ আর সোমনাথের মত রাখী ইতু নন্দিতাও এদিক ওদিক থেকে ইঞ্জিনে উঁকি দিচ্ছে। মিস্ত্রী খুটখাট কি করছে তাই দেখছে।

পেট্রোলের গন্ধ কিংবা ভয়, যে জন্যেই হোক, নন্দিতার মাথাটা ঘুরে গেল। ও সরে এলো ওখান থেকে।

ইতুকে বললে, গা গুলোচ্ছে রে!

ইতু বললে, ভয়ে। বলে হাসলো, কিন্তু সেটাও ভয়ের হাসি।

আর সেই সময়েই অতীশ, বোধহয় স্মার্ট হবার চেষ্টা করে হঠাৎ সোমনাথকে বললে, তুই কি দেখছিস সোমনাথ? তুই এ-সবের কি জানিস?

অপদার্থ, অপদার্থ! নন্দিতা রেগে গেল অতীশের ওপর। ও চাইলো সোমনাথ বলে উঠুক, তুই বা কি জানিস? কে কি জানে তা তো দেখতেই পাচ্ছে নন্দিতা। যে দীপক প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চাবি ঘোরায় আর সিগারেট টানে সেও তো এখন একটা অসহায় শিশু।

কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে নন্দিতা ভেবে পেল না। ওর চোখের সামনে বাড়িটা ভেসে উঠছে বার বার। বাবা মার মুখ, গলিটার চেহারা।

নন্দিতার ঘরে গার্জেন, বাইরে গার্জেন। একটু দেরী করে ফিরলে বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে যায়, মা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে, কিছু বুঝতে চেষ্টা করে, তার পর একটাও কথা না বলে কাজ করে যায় সংসারের। বাবা মা দাদা কেউ কথা বলে না। সব চুপচাপ। কিন্তু তাও সহ্য করা যায়। সবচেয়ে অস্বস্তিকর বাড়ি ফেরার পথটুকু। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলো আড্ডা দেয়, জটলা করে। দলটার বয়েস নন্দিতার চেয়ে তিন চার বছরের ছোট। খেলাধুলো কিংবা পলিটিক্স, কে কোন সালে কোন টেস্টে ক'টা উইকেট নিয়েছিল তার তর্ক, কিংবা পার্ক স্ট্রীটের কোন মদের দোকান কোন লীডারের বেনামী সম্পত্তি। তর্ক আলোচনা যাই করুক, চোখগুলো সব অন্ধকারেও র‍্যাডার হয়ে থাকে। কখনো মেয়েদের পোশাক নিয়ে, কখনো হাঁটাচলা নিয়ে টিপ্পনি কাটে। সমবয়স্ক হলে এতখানি গায়ে লাগতো না। কিন্তু এদের কারো এখনো গোঁফ ওঠেনি ভাল করে।—সাপের জাত মাইরি, পেট আর গলার খোলস ছেড়েছে, দ্যাখ দ্যাখ। দিদির বয়সের একটি মেয়েকে বলেছিল একদিন। নন্দিতার হাতে বইখাতা ছিল, কে একজন বলেছিল, নাইট কলেজে পড়ে নাকি রে। আরেকজন মন্তব্য করেছিল, মিডনাইট কলেজে বল।

এই ছেলেগুলোর জন্যেই নন্দিতার আরো বিরক্তি। দাদাকে বলতে পারতো, কিন্তু উল্টে দাদাও হয়তো বলবে, দোষ কি ওদের, রাত আটটায় বাড়ি ফিরলে বলবেই তো। মা জানলে বলবে, তা সত্ত্বেও তো লজ্জা নেই তোর। তখন রাগ বেড়ে যায়, মনে হয়, শুধু একটু গল্প করার যদি এত দোষ, তা হ'লে সত্যি সত্যি অন্যায়

করে ও শোধ তুলবে।

একটা কমবয়েসী ছেলেকে নন্দিতা চেনে, দু' একদিন কথাও বলেছে ছোট ভাইয়ের মত মনে করে। সে একদিন বললে, নন্দিতাদি, আপনি এত রাত করে ফিরবেন না।—কেন? নন্দিতা তার গার্জেনি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি অভিমান-অভিমান গলায় বলেছিল, ওরা সব যা-তা বলে, আমার খারাপ লাগে।

ছেলেটির ওপর বরং মায়াই হয়েছিল ওর। কিন্তু সকলে যা-তা বলবেই বা কেন? ও কি কারো খায় না পরে!

—কার্বোরেটর ঠিকই আছে। মিস্ত্রীর কথাটা শুনতে পেল নন্দিতা।

কোথাও কোনো লোক নেই। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে শুধু গাড়িটা, ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়া কটি উৎকণ্ঠিত মানুষ। কোনও শব্দ নেই। বাল্‌ব্‌ আবার জ্বলে উঠে এখন জ্যোৎস্নাও অন্ধকার মনে হচ্ছে। সকলেই চুপচাপ, কেউ কোনো কথা বলছে না। মিস্ত্রীর কথা ক'টা সেই স্তব্ধতা ভাঙলো।

মিস্ত্রী আবার বললো, ডিস্ট্রিবিউটরের পয়েণ্ট খারাপ হয়েছে হয়তো, দেখছি...

অনেকক্ষণ আবার খুটখাট চললো। শেষে মিস্ত্রীর কথা শোনা গেল। লোকটা যন্ত্রপাতি তুলতে লাগল থলেতে। বললে, এ সি পাম্পের গোলমাল হতে পারে, আর কনডেনসারও দেখতে হবে। সুইচের কানেকশনও।

–হবে না? রাখী ইতু একসঙ্গে বলে উঠলো।

দীপক যেন কিছুই বুঝতে পারছে না এমন ভাবে তাকালো মিস্ত্রীর মুখের দিকে।

নন্দিতা বলে উঠলো, তা হলে?

রাখী ইতু নন্দিতা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তিনটি মুখই তখন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দীপক অতীশ সোমনাথের দিকে ওদের আর তাকাতেও ইচ্ছে করছে না।

মিস্ত্রী বনেট বন্ধ করে বললে, ডাকবাংলো আছে, সার্কিট হাউস আছে, দেখুন না বাবু গিয়ে, রাত্রে থেকে যান। কাল সকালে ঠিক করে দোব।

মিস্ত্রীটা ধীরে ধীরে চলে গেল দীপকের কাছ থেকে দু'টো টাকা নিয়ে।

আর রাখী ইতু নন্দিতা হাইওয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। জীপ কি গাড়ি পেয়ে গেলে একটা লিফ্‌ট্‌ চেয়ে নেবে। কিংবা লরীতে।

এখানে একটা রাত্রিবাস! বাড়িতে কোনো খবর পর্যন্ত না দিয়ে? থরথর করে সারা শরীর কাঁপছে তখন নন্দিতার, রাখীর, ইতুর।

সমস্ত পৃথিবী তখন ওদের চোখের সামনে অন্ধকার।

কারও ওপর ভরসা নেই, কারও ওপর ভরসা নেই।

রাখী রেগে গিয়ে বললে, ওরা আমাদের কথা ভাবছে না, ভাবছেই না। রাগটা চোখের জল আর ফোঁপানি হয়ে গেল।

হাইওয়ের চড়াই বেয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে রাখী হঠাৎ কেমন দাঁতে দাঁত চেপে নৃশংস গলায় বলে উঠলো, সব ওদের পলিসি, আমাদের আটকে দেবার জন্যে।

ইতু বললে, অতীশ, অতীশও হতে পারে। আমি একজনকেও বিশ্বাস করি না।

নন্দিতা কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, আমাদের যেন বাড়িঘর নেই। আমাদের যেন জবাবদিহি করতে হবে না ফিরে গিয়ে। কি বলবো বল তো মাকে?

হাইওয়ের ওপর উঠে এক পাশে দাঁড়িয়ে কি করবে ওরা ঠিক করতে না পেরে আবার সেই পিছন ফিরে তাকালো। এতক্ষণ রাগে জ্বলছিল বলে পিছন ফিরে তাকায়নি।

দেখলো, ওরা তিনজনই আসছে। দীপক, অতীশ, সোমনাথ।

অনেক পরে পরে এক একখানা মালবোঝাই লরী আসছে। দূর থেকে তীব্র হেডলাইটের ক্রুদ্ধ চোখ, ক্রুদ্ধ আর ভয়ংকর। হাত তুলে থামাতেও ভয় হয়। থামিয়েই বা কি লাভ। প্রত্যেকটিতে তিন চারটি করে লোক ড্রাইভারের সীটে। পিছনে পাহাড়-প্রমাণ মালপত্র। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ঐ লরীতে দু' একজনের যদি বা জায়গা হয়, কারো সাহস নেই। দীপক? দীপক সংগে থাকলে? ফুঃ। রাখীর চোখে দীপকের লম্বা পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি চেহারা এখন চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। একটা মাতাল লরী-ড্রাইভারের হাতে পড়লে দীপক ওকে বাঁচাবে? ফুঃ।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল ইতু। হঠাৎ বলে উঠলো, কি করা যায় বল্ তো?

অতীশ শুনতে পেল ইতুর কথা। বললে, কোনো গাড়ি এসে পড়লে লিফ্‌ট্ চাওয়া যায়। তাছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

লিফ্‌ট্ চাওয়া যায়! যেন নতুন কিছু বলছে, যেন আর কারো মাথায় আসেনি। অতীশের বোকামিতে চটে গেল ইতু। আর অতীশ তা বুঝতে না পেরে ঠাট্টা করে বললে, সামনে জায়গা না থাকলে ইতুকে পিছনে মালের ওপর বসিয়ে দিলেও চলবে।

ইতুর সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, অনেকগুলো লরী পার হতে দিয়ে শেষ অবধি একজোড়া কড়া আলোর হেডলাইট চোখে পড়লো। ঝড়ের মত এগিয়ে আসছে গাড়িটা। দোনলা বন্দুকের দুটো গুলির মত।

ওরা রাস্তার ধারে সরে এলো চাপা পড়ার ভয়ে, তারপর দুহাত তুলে সকলে মিলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

একখানা জীপ। ড্রাইভার প্রথমে বোধহয় ভয় পেয়েছিল, রাখী ইতুদের দেখে জোর ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল ওদের অনেকখানি পার হয়ে গিয়ে।

গাড়িটা যখন দূরে ছিল তখন ওদের সকলের ওপর হেডলাইটের আলো পড়েছিল। আর তখন এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, তিনটি অসহায় ভীত সন্ত্রস্ত মেয়ে যেন তিনটি নির্লিপ্ত অহংকারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারপরই তীব্র আলোর চাবুক তাদের প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে ছুটে গেল, নতুন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ ব্রেক কষার একটানা আওয়াজে ওরা

দেখতে পেল জীপটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সোমনাথ আর দীপক ছুটে গেল। রাখীরাও দ্রুত এগিয়ে গেল।

—আছে আছে, জায়গা আছে। সোমনাথ চিৎকার করলো।

দীপক জোর গলায় ডাকলো।—রাখী, শিগগির।

ওরা তিনজনই ছুটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে অতীশও।

কিন্তু ততক্ষণে অতীশ আর দীপক একটা সমস্যার সামনাসামনি। জীপটার মধ্যে কে আছে, কি আছে এতক্ষণ ওরা ভাল করে দেখতেই পায়নি। চোখে গাড়ির তীব্র আলোর ঘোর কেটে যেতেই দেখলে জীপটার সামনে ভিতরে লোকে ঠাসা।

—দো আদমি, সির্ফ দো আদমি। তাদের মধ্যে থেকে একজন বললে, একজন ঘাড় ফিরিয়ে রাখীদের দিকে ফিরে তাকালো।

দীপকের মনে হলো অন্ধকারে একজনের চোখে যেন হাসি খেলে গেল।

দু'জন, শুধু দু'জন।

দীপক অতীশের মুখের দিকে তাকালো। অতীশ রাখী আর নন্দিতার মুখের দিকে তাকালো। ইতু দীপকের মুখের দিকে তাকালো।

—তিনজন, তিনজনও হয়ে যেতে পারে। সোমনাথ বোধহয় বলে উঠলো।

তারপর ওরা সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। যে লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে রাখীদের ছুটে আসা দেখছিল তাকে অতীশের খারাপ লাগলো। অন্ধকারে যে-লোকটার চোখ হেসেছিল তাকে দীপকের ভয় করলো।

রাখী ইতু নন্দিতা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

'তিনজন, তিনজনও হয়ে যেতে পারে,' কথাটা তখনো ওদের কানে ভাসছে। কিন্তু ওরা তিনজন, শুধু রাখী, ইতু, নন্দিতা? অসম্ভব।

—না, না, একা আমরা? আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! রাখী ফিসফিস করে অতীশকে বললে।

দীপক ভাবলে, আমি রাখী আর—না, ইতু নয়, অতীশ। দীপক নিজেই একটু ভয় পেয়েছে, কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বললো না। অতীশ ভাবলো, রাখী আর নন্দিতা আর দীপক। ওর মনের মধ্যে গোপন ইচ্ছেটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সোমনাথ কিছু ভাবলো না, ও শুধু অসহায় তিনটি মুখের দিকে তাকালো।

অতীশ হঠাৎ বললে, ইতু তুই বরং থেকে যা। দীপক, তুই রাখী আর নন্দিতাকে নিয়ে...

ইতুর চোখে আগুনের ফুলকি। কি ভেবেছে অতীশ ওকে? ও কি সত্যি খারাপ মেয়ে? পার্ক স্ট্রীট থেকে তুলে এনেছে নাকি? ওর কি বাড়ি ফেরার প্রশ্নটা কোনো সমস্যা নয়? ওর ইচ্ছে হলো অতীশের গালে ও ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

দীপক ভাবলে, ছি ছি, ও এতখানি স্বার্থপর হবে কেন? তার চেয়ে অতীশ কিংবা সোমনাথই যাক্ না। ও কি রাখীকে অতীশের সঙ্গে ছেড়ে দিতে ভয় পায় নাকি।

কিন্তু সে-কথা স্পষ্ট করে বলা যায় না। ও তাই বললে, আমাকে, আমাকে তো গাড়ির জন্যে থাকতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাখী অসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো দীপকের দিকে। কোনো কথা বললো না। নীচ, নীচ, স্বার্থপর। শুধু গাড়িটার কথাই তুমি ভাবতে পারছো। গাড়ির মায়াতেই তুমি এত দেরী করে দিলে। লাস্ট ট্রেন হাতছাড়া হয়ে গেল। যেন

কাল সকালে গাড়ির জন্যে ফিরে আসা যেত না।

ইতু হঠাৎ বললে, আমাকে যেতেই হবে।

দীপক বললে, ঠিক আছে, তোমরা দু'জন, আর অতীশ তুই যা।

সোমনাথ নন্দিতার দিকে দেখিয়ে বললে, কিন্তু ইনি? বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে।

নন্দিতার হঠাৎ মনে হলো ও এদের সঙ্গে এসে ভুল করেছে। দীপক ওকে মানুষ বলেই ভাবে না। ও যে গরীব। ও যে রাখীদের মত স্মার্ট নয়। সুন্দরী নয়। অবাঞ্ছিত। ওদের ওপর যত রাগ সোমনাথের ওপর তা ভালবাসা হয়ে গেল। ওর মনে হলো একা সোমনাথই ওর কথা ভাবছে।

রাখী ইতুর মুখের দিকে তাকালো, ইতুর চোখ যেন বললো, তুই আমাকে ফেলে যেতে চাস? নন্দিতা রাখীর মুখের দিকে তাকালো, তার চোখে অনুনয়—সব বুঝেছি, সব জেনেছি, আজকের মত আমাকে বন্ধু ভাবতে চেষ্টা কর। আমাকে বাঁচা।

—জলদি বাবু, জলদি। জীপের ভিতর থেকে কে বলে উঠলো। হয়তো ড্রাইভারই।

সঙ্গে সঙ্গে রাখী, ইতু, নন্দিতা বলে উঠলো, না, না, এভাবে যাবো না।

না, কেউই যাবে না।

জীপটা হঠাৎ একটা সমস্বর অট্টহাস হয়ে গেল। স্পীডে বেরিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

ওরা ছ'টি প্রাণী তখন দুটি দল হয়ে গেছে। সামনে দীপক, অতীশ, সোমনাথ। পিছনে রাখী, ইতু, নন্দিতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ। সকলেরই আশা, আবার কোনো গাড়ি কিংবা জীপ এসে পড়বে। ওরা আবার সেই স্বস্তির পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে।

পায়ের নীচে পৃথিবী টলছে। পা টলছে। নীচে হু হু স্রোত নদীর দিকে তাকালে মনে হয় ব্রীজটা টালমাটাল টলছে।

শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। এত রাত্রে এখন আর চেষ্টা করারও কোনো মানে হয় না।

ব্রীজ পার হয়ে একটা বাজার। রাস্তার ধারে ধারে ঝুড়িঝোড়ায় তপ্‌সে আর ইলিশ নিয়ে বসেছিল ক'জন। মেকানিক খুঁজতে এসে অতীশ আর সোমনাথ দেখে গিয়েছিল। এখন লোক নেই, মাছ নেই। শুধু ভিজে ঝুড়ি থেকে আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছে মাছের। বাজার হাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক দূরে দূরে কোথাও এক টুকরো আলো জ্বলছে। একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান খোলা।

দীপক আর অতীশ সিগারেট কিনলো। লোকটা কুলো কোলে নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছিল, রাখী ইতুদের দিকে অবাক চোখে তাকালো।

ডাকবাংলো, সার্কিট হাউসের পথ জেনে নিলো দীপক।

পথ চলতে চলতে অতীশ ঠাট্টা করে বললে, জায়গা না পেলে স্টেশন প্লাটফর্ম। হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করলো ও আবহাওয়াটা। ইতুকে বললে, জীপে তুই একা চলে গেলেই পারতিস, লোকগুলোর খুব পছন্দ হয়েছিল, বার বার তাকাচ্ছিল তোর দিকে।

ইতু হাসলো না, কথা বললো না।

নদীর পাড় ধরে ধরে সরু রাস্তা, দু'পাশে দোকান। এখন বন্ধ।

দীপকও গুমোট হাওয়াটা দূর করার চেষ্টা করলো। হেসে বললে, রাখীর বাবা থানায় খবর দিয়েছে কিনা কে জানে। শেষে হাজতবাস না করতে হয়।

রাখী উত্তর দিলো না। ইতু রাগত স্বরে বললে, হ'লে খুশী হবো। সেটাই আপনাদের হওয়া উচিত।

আর কেউ কোনো কথা বললো না।

অনেকখানি হেঁটে এসে একেবারে নদীর ধারে সার্কিট হাউস। সামনে বেশ খানিকটা ফুলের বাগান। জ্যোৎস্নায় ফুলের রাশি ফুটফুট করছে, রঙের ফুল এখন শুধু আলোর ফুলকি।

সার্কিট হাউসের সামনেই একখানা হলঘর। ওরা এগিয়ে গেল চৌকিদারের খোঁজে। অনুনয় বিনয় কিংবা টাকা দিয়ে লোকটাকে ভোলাতে হবে।

একটু এগিয়েই খোলা দরজা, হলঘরে পুরো কার্পেট মেঝেতে, আর তার ওপর সটান পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে—চৌকিদারটা, আর কে হবে! এক কোণে টুলের ওপর টেলিফোন। রিসিভারের তারটা দশ বারো হাত লম্বা। বোধহয় অফিসারবাবুরা ঘরে শুয়ে থাকেন বিছানায়, চৌকিদার কানের কাছে পেঁৗছে দিয়ে আসে।

লোকটা মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। দীপক এগিয়ে গেল। লোকটাকে ডাকলো গায়ে হাত দিয়ে।

চৌকিদারটা ঘুম চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করলো। টলতে টলতে উঠলো।

দীপক অতীশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলো। ঘুম নয়। কাছে এসেই ওরা টের পেয়েছে লোকটা তাড়ি নয়তো মদ টেনে বেহেড হয়ে পড়ে আছে।

চোখ মেলে তাকালো লোকটা, কিন্তু কিছুই বোধহয় দেখতে পেল না। ঘোলাটে

চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করলো। আর ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠলো। লোকটা টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুললো। 'হাঁ হুজুর', 'হাঁ হুজুর', 'হাঁ হুজুর'। টেলিফোনের লম্বা তার মেঝের ওপর পাক খেয়ে পড়ে ছিল, রিসিভার রেখে আবার টলতে টলতে আসতে গিয়ে ওর পায়ে জড়িয়ে গেল। দীপক আর অতীশ তা দেখে হেসে ফেললো, কিন্তু হাসতেও সাহস হলো না। পাছে লোকটা চটে যায়।

চৌকিদার টেলিফোনে কি শুনলো কে জানে, কোমর থেকে চাবির গোছা বার করে টলতে টলতে গিয়ে একখানা ঘর খুলে দিলো। তারপর দীপকদের ইশারা করলো ঘরের দিকে যাবার জন্যে। আর ওরা সেদিকে পা বাড়াবার আগেই লোকটা মেঝের কার্পেটের ওপর সটান শুয়ে পড়লো।

দেয়াল হাতড়ে আলো জেবলেই দীপক বলে উঠলো, বাঃ, চমৎকার ঘর।

অতীশ বললে, মাঝরাতে অন্য কেউ এসে না বের করে দেয়। টেলিফোনে হয়তো কারো জন্যে বুক করলো, ও ভেবেছে আমরাই সেই লোক। বলে হাসলো।

ওরা সকলেই পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো ভয়ে ভয়ে। ওদের মোটেই প্রাপ্য নয় এমন একটা জিনিস যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ভোগ করতে চলেছে।

ঘরখানা বেশ বড়ো, আর সাজানো। দরজায় জানালায় বেশ পরিচ্ছন্ন পর্দা, দু'খানা সিংগল বেড খাট দূরে দূরে, দেয়ালে রাষ্ট্রপতির ছবি, একটা আয়না-বসানো টেবিল, একখানা গা-এলানোর চেয়ার।

ক্লান্তিতে সোমনাথ বিছানার ওপর ধপ্ করে বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আরে, ডানলোপিলো যে!

নন্দিতা নিজেও আশ্চর্য হয়েছিল বসতে গিয়ে।

কিন্তু অতীশ বলে উঠলো, দেখে নে সোমনাথ, দেখে নে, আগে তো দেখিসনি।

শুনে অতীশকে নন্দিতার ভীষণ খারাপ লাগলো। মফঃস্বল শহর থেকে মামাতো বোন একবার কোলকাতায় এসে সিনেমা গিয়েছিল ওর সঙ্গে, বলে উঠেছিল, কি সুন্দর রবারের গদি রে! তখন কথাটা খুব খারাপ লেগেছিল নন্দিতার। এখন অতীশকেই খারাপ লাগলো।

কিন্তু তার চেয়েও বিশ্রী লাগছিল ওর সমস্ত ব্যাপারটা। কিছু বলা যায় না, মা-বাবা হয়তো ভেবে বসে আছে, নন্দিতা কারো সঙ্গে প্রেমট্রেম করে পালিয়েছে। ওর পড়ার টেবিল তন্ন তন্ন করে খুঁজছে হয়তো, কিছু চিঠি-ফিটি লিখে রেখে গেছে কিনা দেখার জন্যে।। ভাবতেই নিজের মনেই না হেসে পারলো না ও।

অস্ফুটে বললে, বাড়িতে কি কাণ্ড হচ্ছে কে জানে।

অ্যাটাচ্‌ড বাথ, আয়না, বেসিন, সাজানো ঘর, মেঝেতে কার্পেট, কুঁজোয় জল, কাচের গেলাস। একে একে সকলে জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়লো, মুখ হাত ধুয়ে এলো, কানে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলো। কুঁজোসুদ্ধ উপুড় করে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেল দীপক।

দু'খানা খাটে সবাই তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়েছে, আধশোয়া, কেউ পা ঝুলিয়ে বসে। ক্লান্তিতে আর দুর্ভাবনায় কারো শরীর আর বইছে না।

দীপক নীচে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লো। অতীশকে বললে, ওরা সব বড্ড রেগে আছে, ওদের খাটফাট সব ছেড়ে দে। তারপর পাশ ফিরে বললো, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

রাখী ইতু কানাকানি করেছে এর আগেও। এবার ফিসফিস করে পরস্পরকে কি বললে। তারপর দীপকের কথার জবাবে রাখী বললে, আমরা ঘুমোবো না।

রাখীর কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে দীপকের কোনো হাত আছে। ও ইচ্ছে করেই গাড়িটা খারাপ করে রেখেছিল কি না কে জানে। ওরা গাড়িতে ওঠার পর দীপক যখন বার বার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছিল, কোনো কথা বলছিল না, তখন রাখী ভেবেছিল ওকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে দীপক। তারপর দীপক যখন বনেট খুলে কি সব নাড়াচাড়া করলো তখনই কিছু খারাপ করে রাখেনি তো। সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। দীপক ওকে আজ পাগলের মত আদর করতে চেয়েছিল—ব্রীজের ছায়ামাখা বালির পাড়ে। আর সে-সময়েই ভিখিরি ছেলেটা এসে দাঁড়িয়ে রইলো, সরতে চাইলো না। 'মেরেই দেখুন না।' 'পুলিশ আপনাদেরই ধরবে'।...রাখীর নিজের তখন খুবই কুৎসিত লেগেছিল ব্যাপারটা, কিন্তু ছেলেটা ছুটে পালালেও ওর মনে হয়েছিল আসলে দীপকই যেন ছেলেটার সামনে থেকে ছুটে পালাচ্ছে। গাড়িটা খারাপ হয়ে দীপককে এখন আরো তুচ্ছ মনে হচ্ছে রাখীর। নাকি ওর নিজের চরিত্রই বদলে যাচ্ছে! এখন স্বার্থ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা। এখন সবকিছুরই চেহারা কেমন অন্যরকম লাগছে।

দীপকের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাখীর।—আজ রাতটা না হয় এখানেই থেকে গেলে। গাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বলেছিল ঠাট্টা করে। এখন মনে হলো ঠাট্টা না হতেও পারে।

ইতুকে সে-কথা না বলে পারেনি। ইতু ফিসফিস করে বলেছিল, ট্রেন আছে কিনা, বাস আছে কিনা, ওরা কেউ সে-সব খোঁজই নিল না প্রথম দিকে।

রাখী তাই হঠাৎ বলে উঠলো, না না, আমরা কেউ ঘুমোবো না। অর্থাৎ কেউ তোমাদের আর বিশ্বাস করি না।

দীপক প্রথমটা বুঝতেই পারেনি। রাখীর কথা শুনে ও হেসে উঠলো। বললে, বাড়ির কথা ভেবে বাসর জেগে লাভটা কি হবে? তখন যা চেহারা হবে, বাবা-মা ভাববে...

রাখী অবাক হয়ে গেল দীপককে হাসতে দেখে।—তোমার কি হাসতে লজ্জাও করছে না?

ওর রাগ দেখে দীপক আরো হেসে উঠলো।—ঘুমোতে ভয় পাচ্ছো কেন, তোমার ঘুমন্ত রূপ দেখে ফেলবো বলে?

রাখীর সমস্ত ভিতরটা যেন জ্বলে উঠলো। একটু আগেই ওর চোখের সামনে পিসীমার মুখটা ভেসে উঠেছিল। সমস্ত বাড়িটা। মনে হয়েছিল, ও ফেরেনি বলে হয়তো প্রচন্ড তোলপাড় হচ্ছে সেখানে। ও ভাবতে পারছিল না কোন্ মুখে কাল গিয়ে দাঁড়াবে সকলের সামনে। দীপকের হাসিটা ঠিক সেই মুহূর্তে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

ও রূঢ় স্বরে চেপে চেপে বললে, তোমাকে আমি আর একটুও বিশ্বাস করি না। সব ব্যাপারটা তোমার চক্রান্ত।

—চক্রান্ত! মুখ কালো হয়ে গেল দীপকের। মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। এতখানি ছোট ভাবতে পারলে রাখী ওকে! দীপকের মুখ থেকে একটা ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এলো।—এত নীচ মন তোমার!

ছোট্ট চারটি শব্দ, কিন্তু সকলের মনে হলো, একটা বজ্রপাত হলো সেই মুহূর্তে।

সমস্ত ঘরখানা থমথম করতে লাগলো। সিনেমা হলে ছবি চলতে চলতে হঠাৎ সাউণ্ড ফেল করলে যেমন হয়। কেউ একটাও কথা বলছে না, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড কোলাহল সকলেই শুনতে পাচ্ছে।

অতীশ বুঝতে পারলো সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। কিংবা ঘটছে। এ-সময় একটা কথাও বলা চলে না। ইতু স্তম্ভিত, রাখী বা দীপকের দিকে ও চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সোমনাথ ভাবলো, 'আমি এখন এখানে না থাকলেই ভাল হতো। অসহ্য, অসহ্য' ; নন্দিতার মনে হলো, এ অপমান ওর নিজেরও, সব মেয়েদের।

রাখী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। অপমানে লজ্জায় চোখ ঠেলে জল এলো ওর। দীপক এখন আর ওর কাছে কিচ্ছু নয়, কিন্তু দুঃখ সেজন্যে নয়। রাখী নিজেও যে দীপকের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে এ-কথাটাও সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো। কি ভাবছে এখন ইতু আর নন্দিতা? এতদিন যা-কিছু গর্ব করে বলে এসেছে, চারটি মাত্র শব্দ তার সব কিছু মিথ্যা করে দিল। ইতু হয়তো ভাবছে, রাখী একটা সস্তা মেয়ে, যেচে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছিল। নন্দিতা কি ভাবছে কে জানে।

রাখীর মুখ ঘরখানার মতই থমথমে। ও ধীরে ধীরে উঠলো, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু কারো দিকে তাকালো না, ভয়—পাছে কারো সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, হল্‌ পার হয়ে সার্কিট হাউসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বাড়ির কথা, ফেরার জন্যে যত ভয় ছিল মনে, সব উবে গেছে। এখন ওর বুকের ভেতরটা হু হু করছে, হু হু করছে।

বারান্দায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সামনের জ্যোৎস্না-ভেজা নদীর জলের দিকে তাকিয়ে ও আগুনের শিখার মত নিজের আগুনে নিজেই জ্বলতে লাগলো।

এদিকে ঘরের মধ্যে সেই আবহাওয়াটা একটুও হাল্কা হলো না। দীপক অপেক্ষা করে রইলো, রাখী যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তা যেন লক্ষ্যই করেনি ও, কিংবা এমন ভাব দেখালো, যেন লক্ষ্য করার মত বিষয়ই নয় ওটা। অথচ তখন দীপকের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। ঐ চারটি শব্দ উচ্চারণ করে ফেলার জন্যে, হঠাৎ ওভাবে রেগে যাওয়ার জন্যে দীপকের যতই অনুশোচনা হচ্ছিল, যতই নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল, ও ততই নিজের মনের মধ্যে যুক্তির পর যুক্তি গড়ে রেগে উঠছিল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল কি করেনি ও রাখীর জন্যে! অথচ রাখী তার প্রতিদানে কীই-বা দিয়েছে। কিছুই যে পায়নি—সে কথাটা অতীশের কাছেও গোপন রাখতে হয়েছে। কাগজের ফুল বানিয়ে ঘর সাজানোর মত রঙিন মিথ্যে কথাগুলো বুনে বুনে ও শুধু অতীশের কৌতূহল মিটিয়েছে। কিংবা নিজেই নিজের সাধ মিটিয়েছে।

দীপক একসময় দেখল অতীশ উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখলো, অতীশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাখীর খোঁজে।

রাখী সার্কিট হাউসের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। পিছনে হাল্কা পায়ের শব্দে ও বুঝতে পারলো কেউ আসছে। ও ভেবেছিল, দীপক নিজেই।

আর সে-কথা ভেবেই অভিমানে ওর দু'চোখ জলে ভেসে গেল।

অতীশ তখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাখী তার দিকে তাকালো না, তবু বুঝতে পারলো। ওর মনে হলো ও এক্ষুনি ভেঙে পড়বে।

রাখী কোনো কথা বললো না, সিঁড়ি বেয়ে সামনের বাগানে নামলো, খুব হাল্কা পায়ে নদীর ঢালুর দিকে নামতে লাগলো। ওর বার বার সকালের কথা মনে পড়ছিল। এর আগেও মনে পড়েছে, তবু দীপককে সকালের কথা বলতে পারেনি, দীপক কি মনে করবে! হয়তো ভাববে, বিয়ের কথা বলে নিজের দাম বাড়াচ্ছে ও, কিংবা জানতে চাইছে দীপক ওকে বিয়ে করবে কি না। ছি ছি, সেকথা ভাবলেও রাখী ছোট হয়ে যাবে। রাখী নিজেই তো এখনো বুঝতে পারছে না। রাগের মাথায় পিসীমার কথার জবাব দিয়েও কিন্তু ওর হঠাৎ মনে হয়েছিল ছেলেটি কেমন দেখতে, কি করে জানতে অর্থাৎ দীপকের সঙ্গে তুলনা করে নিতেই চেয়েছিল। ও অবশ্য জানে দীপক তার তুলনায় অনেক ভাল, অনেক ভাল! কিন্তু এখন এই রাগের মুহূর্তে ওর হঠাৎ মনে হলো মাকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিল না কেন।

এইসব ভাবতে ভাবতেই নদীর ঢালুর দিকে নামতে লাগলো রাখী।

অতীশ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো।—ফিরে চলুন।

রাখী জলে ভাসা চোখ দুটো তুলে অতীশের দিকে তাকালো।—পারছি না অতীশদা, পারছি না।

অতীশ বললে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। রাখী যেন শুনতে পেল না।—আমার ভেতরটা জ্বলছে। পিকনিক করতে এসে কি হলো বলুন তো? আমার এখন আর ফেরার জায়গা নেই, যাবার জায়গা নেই।

অতীশ চুপ করে রইলো। কি আর বলবে ও। ইতু হলে ও হয়তো ঠাট্টা করে বলতে পারতো, এই পৃথিবীটাও একটা পিকনিক। তারপর হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট নেয় না। সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়। তখন আর ফেরার জায়গা থাকে না, যাবার জায়গা থাকে না।

অতীশ বললে, ফেরার জন্যে আপনি ভাবছেন কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাখী হাসলো। রাখীর এই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছিল, সকালে রাগারাগি না করলেই ভাল হতো। পিসীর কথামত সেজেগুজে কনে হয়ে বসতো, হাঁটতো, তারা হয়তো চুলের গোছ দেখতো, কিংবা একটা গান শুনতে চাইতো। ব্যস্। তারপর ঐ সুইট বোটার মত রাখীও হেসে খেলে বেড়াতো।

—কাল সকালে কোন মুখে ফিরে যাবো? কি বলবো গিয়ে আপনিই বলুন?

রাখী তখন নদীর পাড়ে নেমে যাওয়া ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়েছে।

অতীশ ধীরে ধীরে ওর পাশে বসলো। অতীশের ইচ্ছে হলো রাখীকে সান্ত্বনা দিয়ে ওর সব কষ্ট সব ভাবনা মুছে নিতে। রাখীকে দেখে অতীশের নিজেরও বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল।

—দীপকের কথা ভাববেন না, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। অতীশ বললো।

রাখী যেন দীপকের কথাই ভাবছে! বাড়ি, বাড়িটা এখন ওর মাথার ওপর চেপে বসেছে। কাউকে কিছু না বলে একটা রাত্রি বাইরে কাটিয়ে যাওয়া যে কি, ওরা কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে না।

না, দীপকের কাছে রাখীর আর কোনো দাম নেই। সব ছেলেরাই সমান, দাম দিতে পারলে তবেই দাম থাকে।

কলেজ খোলা থাকলে একটি করে টাকা পেত ও মা'র কাছে। তার ভেতর থেকে চল্লিশটা পয়সা বেরিয়ে যেত শুধু ট্রাম-বাসের ভাড়া দিতেই। ও যে মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতো, মা ভাবতো মাকে খুশী করার জন্যে। কিন্তু তা নয়।

ভীষণ ক্ষিদে পেত বলে। কলেজের ক্যান্টিনে চা আর শুকনো টোস্ট খেয়ে বাকী পয়সা ফুরিয়ে যেত। মাকে বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। অথচ তারই ভিতর থেকে পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। দীপককে কোনোদিন বলতে পারেনি, কত কষ্ট করে ওকে টেলিফোন করতে হয়। কলেজের কাছেই একটা দোকানে গিয়ে ফোন করতো। কিন্তু সে-এক জ্বালা। কলেজের বন্ধুরা কেউ সঙ্গ ছাড়তে চাইতো না। ছেলেগুলোকে তবু ঠাট্টা করে সরানো যেত, ইতু অনুরাধা আরো অনেকে কিছুতেই সঙ্গ ছাড়তো না। ওরা সন্দেহ করতো। যদি-বা ওদের ফাঁকি দিয়ে চলে আসতে পারতো, দোকানের বুড়োটা সরতে চাইতো না। বুড়ো বয়সেও কথাগুলো শোনার জন্যে কান পেতে থাকতো। ওতেই ওদের আনন্দ। কিন্তু টেলিফোনের জন্যে কড়কড়ে পাঁচ-আনা পয়সা দিতে বড্ড গায়ে লাগতো রাখীর। যেদিন রং-নাম্বার হয়ে যেত কিংবা দীপককে পাওয়া যেত না, সেদিন মনমেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে যেত। আরেকবার ফোন করতেও পারতো না। যেদিন ওদিকে খদ্দের থাকতো রং-নাম্বার হলে বুড়োটাকে জানাতো না। এখন ইতু সবই জানে, ফোন করার সময় সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেও এক অসুবিধে। দীপক রাগ করলে, ও আবেগের গলায় কথা বলতে পারে না। একদিন বলেছিল। শুনে ইতু উপদেশ দিয়েছিল, এত কিসের রে! সাধতে যাবি কেন। ওর না পোষায়, টুসকি দিলে কত ছেলে তোকে লুফে নেবে।

ইতুই বোধহয় ছেলেদের ঠিক বোঝে। শুধু রাখীই ভাবতো, প্রেম আছে। আজ সে-ভুলও ওর ভেঙে গেল। দীপক ওকে কি ভেবেছে কে জানে। হয়তো ভেবেছে, আর সব মেয়েদের মত রাখীকেও গাড়ি দেখিয়ে, ভালো রেস্টোরেণ্টে নিয়ে গিয়ে ওর মন ভুলিয়েছে।

অথচ ঠিক সময়ে পেঁছনোর জন্যে রাখী কোন কোনোদিন ট্যাক্সি করতে বাধ্য হয়েছে। দাদার কাছে দে না দাদা, দে না দাদা, মা'র কাছে হাত পাতা—সে-সব যেন কিছু নয়।

এত দুঃখের মধ্যেও রাখী হেসে উঠলো।—আমি সকালেই জানতাম সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।

অতীশ সান্ত্বনা দেবার জন্যে রাখীর হাতের ওপর হাত রাখলো।—কি করে?

নার্ভাস হাসি হাসলো রাখী। একে একে সব কথা, ওকে কাল দেখতে আসার কথা বলে ফেললো।

অতীশ হেসে উঠলো। বললে, তবে আর ভয় নেই।

—ভয় নেই? রাখী মুখ ফিরিয়ে অতীশের চোখের দিকে তাকালো।

অতীশ আবার হাসতে হাসতে বললে, সকালে পেঁছেই ইতু বরং সঙ্গে যাবে আপনার। বলবে, বিয়ের কথায় রাগ করে আমাদের বাড়িতে ছিল।

রাখীর মুখ হাসি হয়ে উঠলো। ও অতীশের দিকে তাকালো মুগ্ধ দৃষ্টিতে। বললে, ঠিক ঠিক, ইতুদের বাড়ি কেউ চেনে না।

অতীশ রাখীর হাতের ওপর থেকে হাতটা তুলে নিয়ে রাখীর কাঁধের ওপর রাখলো। সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

অতীশের হাতের স্পর্শ রাখীর খুব ভাল লাগলো। অতীশ কত সহজ। অতীশের হাত কিছু বলতে চাইলো কিনা রাখী বুঝতে চেষ্টা করলো না।

ছোট্ট একটা ঘটনা, গাড়ি স্টার্ট নিলো না। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা বদলে গেল ওর চোখে। দেখলো, জীবনটা পিকনিক নয়। দেখলো দীপক দীপক নয়, মানুষগুলো সব বদলে গেছে। ও এখন শুধুই একটা সান্ত্বনার হাত চাইছিল। যে কোনো হাত।

ঘরের মধ্যে এখন চারজন। চারজনই একেবারে চুপচাপ। ওদিকের খাটে সোমনাথ। এদিকের খাটে এক কোণে নন্দিতা হাঁটু মুড়ে বসে আছে, আর ধার ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে ইতু তাকিয়েছিল দীপকের দিকে। দীপক পাশ ফিরলো, ইতুর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ সরিয়ে নিলো অস্বস্তিতে।

ইতু খুব আস্তে আস্তে হঠাৎ বললে, দোষ আপনারই।

দীপক আবার তাকালো ইতুর দিকে। আবার চোখ সরালো। এবার অস্বস্তি অন্য কারণে। ইতুর শরীরটা এখন লোভের শিশির মেখে ফুটন্ত পদ্ম হয়ে আছে।

দীপক চোখ নামিয়ে বললে, এখন সব দোষই তো আমার। আমার যেন কোনো ভাবনা থাকতে নেই, আমার বাড়ি ঘর নেই, বাড়িতে রুগ্ন মা'র জন্যে কোনো চিন্তা নেই।

—আপনার মা'র অসুখ, আপনি তো বলেননি?

দীপক কোনো জবাব দিল না। ওর মন এমনিতেই বিষিয়ে ছিল, তারপর গাড়ি, গাড়ি। নিজেকে ওর তখন অত্যন্ত অসহায় আর অপমানিত লেগেছে। এই গাড়িটাই যখন ওর মাথার ওপর চেপে বসেছে, যখন বুঝতে পেরেছে ও একটা অসহায়তার জালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, তখন ওই পাঁচ পাঁচটা মানুষ দীপকের চোখে মনে হয়েছে স্বার্থপর, স্বার্থপর। সবচেয়ে স্বার্থপর রাখী নিজে। দীপককে ফেলে রেখে পালাতে পারলে বাঁচে। ট্রেন কিংবা কোনো গাড়িতে লিফ্‌ট পেলে নিশ্চয়ই ওরা চলে যেত দীপককে একা ফেলে রেখে। দীপকের মনে হলো ওর চোখ খুলে গেছে। ওর মনে হলো, জীবনটা ঠিক পিকনিক নয়। মা'র কথা ওর একটুক্ষণ আগে মনে পড়েছে! অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা ওঠে মাঝে মাঝে, কিছুতেই অপারেশন করাবে না। বাবা বড্ড ভালমানুষ, জানেই না হঠাৎ কিছু হলে কি করতে হবে। দীপক নিজে বাড়িতে থাকলে, আর ওর গাড়িটা—দীপক একটুও ভয় পায় না। তেমন তেমন কিছু হলে পনেরো মিনিটে ও মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে, কিংবা নার্সিং হোমে। চেনাজানা সার্জেনকে ফোন করে ব্যবস্থা করতে পারবে। দীপকের ভয় হলো আজই রাত্রেই না বিশেষ কিছু ঘটে যায়। অপারেশন করার আগে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বার্স্ট করলে আর নাকি বাঁচানো যায় না। সারাজীবন সেই অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হবে তখন। ছোট বোন মিনু তখন বলবে, দাদা, তুই মাকে মেরে ফেললি! বাবার চোখ বলবে, অপদার্থ, অপদার্থ! দীপক নিজেও দুঃখে শোকে...ভাবতেও ভয়, দীপক ঘেমে উঠলো। রাখীর খেয়াল-খুশী রাখতে গিয়ে কি বোকামিই না করে বসেছে। রাখীর ওপর এখন দীপক তিক্ত-বিরক্ত।

—এই দীপকদা, আপনি অমন গোমড়া মুখ করে থাকবেন না। খাট থেকে হাত বাড়িয়ে ইতু দীপকের জামা ধরে টানলো।

দীপক তাকালো, হাসবার চেষ্টা করলো। বললে, তুমি বুঝবে না ইতু, আমার ভিতরটা আজ কি হয়ে গেছে তুমি বুঝবে না। কিন্তু চোখ সরিয়ে নিলো।

ইতু আবার হাত বাড়ালো।—এই তাকান, আমার দিকে তাকান, শুনুন। আমি বলছি, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনার, মা'র জন্যে কিচ্ছু ভাবনা নেই, দেখবেন।

কথাগুলো কেমন যেন দীপককে আশ্বস্ত করলো। কিংবা ইতুর কথাতেই

নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিল। দীপকের মনে হলো ইতুকে ও চিনতেই পারেনি। ইতু কত ভালো, কত নরম মন ওর। বাড়ির সম্পর্কে ওরও তো দুর্ভাবনা, তবু দীপককে কত স্নিগ্ধভাবে ও সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাখী শুধু নিজের কথাই ভাবতে জানে।

রাখীর কথা মনে পড়লো দীপকের, কিন্তু ও মুখে বলল, আরে, অতীশ তো ফিরলো না।

ইতু বললে, সত্যি। রাখী কোথায় গেল তবে!

ইতু খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো, ভায়োলেট রঙের কার্ডিগানে শুধু বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, চলুন, চলুন, কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

দীপক অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়লো। বললে, কোথায় আর যাবে, এখানেই আছে কোথাও।

ওরা দুজনেই বেরিয়ে এলো। সার্কিট হাউসের বারান্দায় দাঁড়ালো, এদিক ওদিক তাকালো। সামনের হল্-এ আলো জ্বলছে, বেহুঁস চৌকিদার তেমনি পড়ে আছে মেঝের ওপর। টেলিফোনের দিকে চোখ যেতেই দীপকের মনে হলো এখান থেকে হয়তো ট্রাংক কল্ করা যায়। ইতু ভাবলো, আরেকটু আগে টেলি-ফোনের কথা মনে পড়লে হতো। বাড়ি ফিরে কি অজুহাত দেবে মনে মনে অনেকরকম ভেবে রেখেছে ইতু। ভেবে রেখে কোনো লাভ হয় না। ফিরে গিয়ে থমথমে আব-হাওয়াটা দেখে হঠাৎ যেটা মুখে এসে যায়, সেটাই দেখেছে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু আজকের কথা অন্য। আজ যে সারা রাত্রি বাইরে কাটাতে হলো। ও ভাবতেই পারছে না কি বলবে ও ফিরে গিয়ে। কি আর বলবে। 'অনুরাধাদের বাড়ি এসেছিলাম এ পাড়ায়, সন্ধ্যে থেকে ভীষণ গোলমাল, বোমা ফাটছে, হৈ চৈ, আজ এখানেই থেকে যাচ্ছি।' ফোনে দিব্যি বলে দেওয়া যেত। না, ট্রাংক কলে বলা অসুবিধে ছিল।

—কৈ, রাখী অতীশ কাউকেই তো দেখছি না। দীপক হঠাৎ বললে।

ইতুও চারপাশ তাকিয়ে দেখলো। ভাবলে, সামনের রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্। ইতু দু'চার পা এগিয়ে গেল। দীপকও।

সমস্ত শরীরে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ জাগলো ইতুর। আশ্চর্য, আশ্চর্য। মধ্যরাত্রিকে ও কোনোদিন দেখেনি, মাঝরাত্রের লোকালয় কোনোদিন না। ওর হঠাৎ মনে হলো পৃথিবী ঘুরতে ভুলে গেছে, থেমে গেছে। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো শব্দ নেই। নিজেদের পায়ের শব্দ ছাড়া। সামনের রাস্তাটা বাজারের ভিতর দিয়ে ব্রীজে গিয়ে উঠেছে। তখন এক চেহারা ছিল, এখন একেবারে অন্য।

দীপক হঠাৎ বললে, গাড়িটা কেন স্টার্ট নিলো না বুঝতে পারছি না।

ওর মাথার মধ্যে আবার গাড়িটা তখন ফিরে এসেছে। দিব্যি এতখানি পথ এলো, কোথাও কোনো গোলমাল হলো না, অথচ ফেরার সময়...কীই-বা হতে পারে!

ইতু হাসলো। বললে, যন্ত্র যন্ত্রই। কেন এত ভাবছেন। কাল সকালে মেকানিক এলেই ঠিক হয়ে যাবে।

দীপক কোনো কথা বললো না। ওর মনে হলো কোনো কিছুই আর আগের মত ঠিক হয় না।

ইতু খুব ধীর পায়ে রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে, আপনার মা'র কি অসুখ বললেন না?

দীপক বললে, যে-কোন সময়ে বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। মাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারি না। সব সময়ে ভয় হয়...

ইতু হাল্কা পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, কিচ্ছু হবে না, কোনো ভয়

নেই, দেখবেন আমি বলছি কিচ্ছু হবে না। তারপর এদিক ওদিক ও তাকালো রাখীর খোঁজে, অতীশের খোঁজে। নিজের মনেই বললে, কিন্তু কোথায় গেল ওরা। রাখী বড্ড জেদী।

দীপকের মন বললো, সত্যি, রাখী বড্ড জেদী। ইতু সে জায়গায় কত নরম মনের মেয়ে। ইতুকে ও যেন এতকাল চিনতেই পারেনি, বুঝতেই পারেনি। বাইরে কঠিন, কথায় ঝকমকে, অথচ ওর ভিতরটা ঝিনুকের মত, জ্যান্ত ঝিনুকের মত নরম। আঘাত পেয়েছিল নিশ্চয়ই কখনো, একটা বালির কণা বিঁধে গিয়েছিল শরীরে। খোলস দিয়ে দিয়ে মুক্তো হয়ে গেছে।

—তোমাকে কেউ চিনতে পারে না ইতু, আমিও পারিনি। দীপক ধীরে ধীরে বললে।

ইতু হাসলো।—আমি তো নিজেই নিজেকে চিনি না। আমার সত্যি এক একবার রাখীর মত ভাল হতে ইচ্ছে করে।

দীপক কোনো কথা বললো না।

কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু শ্বেতপদ্ম জ্যোৎস্না হয়ে আকাশ ফুটে আছে। ব্রীজের ওপর সেই আলো, নদীর জলে, রাস্তায়, গাছের মাথায়, বাড়ির ছাদে।

ব্রীজে ওঠার বাঁকটিতে হঠাৎ থেমে পড়লো দীপক। ইতুও। এদিক ওদিক তাকালো।

ইতু বললে, রাখী বোধ হয় এদিকে আসেইনি।

দীপক বললে, বাগানের ওদিক দিয়ে বোধ হয় রাস্তা আছে, কিংবা নদীর দিকে যাওয়া যায়।

—চলুন ফিরি।

দীপক দাঁড়িয়ে রইলো একমুহূর্ত। যেন ইতুর কথাটা ওর কানেই যায়নি। 'আমার সত্যি এক একবার ভাল হতে ইচ্ছে করে।' ইতুর সেই কথাটাই এখনো ওর কানে বাজছে। দীপকের হঠাৎ মনে হলো ইতুর পাশে পাশে হাঁটতে ওর ভীষণ ভাল লাগছে। ইতুর দীর্ঘ শরীর, শরীরের ছন্দ, ইতুর কাঁধ এক একবার ওর বাহু ছুঁয়ে যাচ্ছে...ইতু কত সহজভাবে হাঁটছে। দীপকের মনে হচ্ছে ইতুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ও কোনো দিন ক্লান্ত হবে না।

—তুমি তোমার মতই ভাল থেকো। 'আমার সত্যি এক এক সময় রাখীর মত ভাল হতে ইচ্ছে করে' কথাটার জবাব হিসেবেই ও যেন এতক্ষণে বললো।

ইতু হাসলো।—কাউকে কষ্ট দিয়ে আমার ভাল থাকতে ইচ্ছে করে না। কারো কষ্ট দেখলে আমি পারি না...

দীপক আবার হাঁটতে শুরু করেছে তখন, ব্রীজের দিকে।

ইতু বললে, ফিরে চলুন। এখন অনেক রাত। রাখীরা হয়তো ফিরে গেছে।

দীপক বললে, গাড়িটা আমাকে টানছে, ইতু। গাড়িটা একবার দেখে যাই। তখন রাগের মাথায় মনে হয়েছিল, ওটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলি।

ইতু হেসে উঠলো।—আপনার ভালবাসার নিয়মই ঐরকম।

দীপক হাসলো।—এখন ওটাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। আমার চোখ খুলে দিয়েছে ওটা।

ইতু হাসলো।—দীপকদা, সব ভুল। আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারি না।

ব্রীজের ওপর দিয়ে তখন ওরা হাল্কা পায়ে হেঁটে চলেছে। হেঁটে যেতে যেতে ইতু একবার সার্কিট হাউসের দিকে ফিরে তাকালো। পরক্ষণেই আবার। নদীর

ঘাটের সিঁড়িতে জ্যোৎস্নায় মাখা দুটি মানুষকে দেখতে পেল ও। পাশাপাশি।

ইতু হঠাৎ দীপকের হাত ধরে ফেলেছে তখন, হয়তো বলে উঠতো কিছু, কিন্তু কিছু বললো না ও।

হাতটা না ছেড়েই ও বললে, আমরা সব তাসের মত দীপকদা, শাফ্‌ল্‌ করলেই পরিচয় বদলে যায়। ফিরে গিয়েই দেখবেন, রাখী ঠিক সেই আগের মতই।

—ফিলজফি শুনিয়ো না। দীপক ইতুর হাতে একবারটি চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলো।

ইতু হঠাৎ গাঢ় দীর্ঘশ্বাসে বললে, সত্যি, দীপকদা, বলুন তো, প্রেম বলে কিছু আছে? আমরা শুধুই বোধ হয় রুমালচোর খেলছি।

দীপক মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো। ওদের দু'জনের শরীরের ওপর তখন অঝোর ধারায় জ্যোৎস্নার রেণু ঝরে পড়ছে। কার্ডিগানটা কখন পরে নিয়েছে ইতু। ইতুর শরীরটাকে সেই মুহূর্তে আলোর ঝর্না মনে হলো দীপকের। পাথরে পাথরে ধাক্কা খাওয়া অশ্রুর বন্যার মত।

দীপক ইতুর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললে, আছে, এইমাত্র আমি আবিষ্কার করেছি, আছে।

দুখানা সিংগল বেড খাট, মাঝখানে দেড় ফুট ফাঁক। এদিকের খাটে হাঁটুমুড়ে বসে ছিল নন্দিতা। ওদিকের খাটে সোমনাথ কনুইয়ের ভর দিয়ে আধশোয়া। ঘরের মধ্যে শুধু ওরা দু'জন। কিন্তু নন্দিতার এখন আর কোনো অস্বস্তি লাগলো না। সমস্ত হাওয়াটা এখন বদলে গেছে। নন্দিতা হাঁটুর ওপর মুখ নামিয়ে চোখ বুজে বাড়ির ছবিখানা দেখে নিচ্ছিল। বাবা চুপচাপ, মা'র মুখ থম্‌থমে। নন্দিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মা নন্দিতার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। একটাও কথা বলছে না। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। তার আগেই দাদা এগিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে, অবাক হয়ে তাকালো নন্দিতার দিকে। ধুলোয় বাতাসে নন্দিতার রুক্ষ চুল, শাড়িতে ক্লান্তির ভাঁজ, চোখেমুখে রাত জাগার ছাপ —দাদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, যেখান থেকে এসেছিস সেখানেই ফিরে যা। এক্ষুনি, এক্ষুনি।

—দেখি আপনার হাতটা! সোমনাথের গলা শুনতে পেল ও।

চোখ তুলে তাকালো। সোমনাথ আধশোয়া ভঙ্গিতেই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেখতে পেল। নন্দিতা বুঝতে পারলো না, তবু বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল। মুখে বললে, কেন?

সোমনাথ হাত বাড়িয়ে নন্দিতার হাতটা কাছে টেনে নিয়ে কি যেন দেখলো। তারপর বললে, জানতাম।

নন্দিতা তখনো বুঝতে পারলো না। ও ভাবলো সোমনাথ হাত দেখতে জানে। সাংঘাতিক কিছু হবে সেইটুকুই বলতে চায়। তাই নার্ভাস গলায় বললে, কি দেখলেন?

—টেলিফোন নম্বর। নেই, মুছে দিয়েছেন।

এতক্ষণে নন্দিতার মনে পড়লো। ও সত্যিই ভেবেছিল ব্যাগের মধ্যে কোনো কাগজের টুকরোয় লিখে রাখবে। কিন্তু তারপর কত কি ঘটে গেল, গাড়ি স্টার্ট নিলো না, বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ধুয়েছে সকলেই—মুছে তো যাবেই। এর পর নন্দিতা হয়তো আবার জেনে নিতো। কিন্তু সোমনাথটা কি! ও এখনো ঐ-সব প্রেমট্রেমের কথা, দেখা করার কথাই ভাবছে! নন্দিতার মধ্যে এখন যে কি হচ্ছে, কি দুর্ভাবনা, তা কি একটুও টের পাচ্ছে না?

সোমনাথের খবর ও একটু একটু জেনেছে। কোন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে, সকালে ল' কলেজ। থাকে হোস্টেলে। ওর আর ভাবনা কি। কিন্তু তা বলে নন্দিতার কথাও ভাবছে না?

সব ব্যাপারটা খুলে বলতে নন্দিতার ইচ্ছে হলো না। ছেলেগুলো অবুঝ, ওদের কিছু বোঝাতেও ইচ্ছে করে না।

কিন্তু সোমনাথ সত্যিই অবুঝ নয়। ও ধীরে ধীরে বললে, আপনি নিশ্চয় বাড়ির কথা ভাবছেন!

নন্দিতা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করলো।—কি করে বুঝলেন?

—আপনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

—বোধহয় সেই ভদ্রলোকের কথা ভাবছিলাম।

কথাটা মিথ্যে, জেনে গেছে সোমনাথ। তাই চুপ করে রইলো, কোনো কথা বললো না।

নন্দিতা হঠাৎ অভিমানে ফেটে পড়লো, চোখ ছাপিয়ে জল এলো। বলে উঠলো, আপনারা কি ভাবেন বলুন তো আমাদের!

অভিমান শুধু সোমনাথের ওপর নয়। শুধু দীপক অতীশদের ওপর নয়। এর আগেও যে দু' একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের ওপরও। ওরা কেউ বুঝতে পারে না যে, নন্দিতা নিজেও ভালবাসতে চেয়েছে, নন্দিতার মনেও রোমাঞ্চ জেগেছে। ভালবাসা দিতে গেলেই ওরা তাকে সস্তা করে দেয়। যেন বাড়ির জন্যে, বাবা-মা'র জন্যে ওদের কোনো ভয় থাকতে নেই। ছেলেদের ভালবাসা এত হিংস্র হয় কেন, নন্দিতা বুঝতে পারে না। ওরা চায় ভালবাসতে হলে সমস্ত শরীর মন জুড়ে শুধু একটাই চিন্তা থাকবে—প্রেম। শুধুই একজন তাকে সর্বগ্রাসী হয়ে ঘিরে থাকবে।

সোমনাথ এতক্ষণে সান্ত্বনার সুরে বললে, সত্যি, পিকনিকে এসে মিথ্যে আপনাকে বিপদে ফেলা হলো।

—আমাদের আর বিপদ কি। নন্দিতা অভিমান চাপা দেবার জন্যে হেসে উঠলো।

সোমনাথ ধীরে ধীরে বললে, আপনার বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।

সোমনাথের এবার সত্যি কষ্ট হলো নন্দিতার জন্যে। ও হাত বাড়িয়ে নন্দিতার হাতখানা ধরলো আবার! মনে হলো নন্দিতা থরথর করে কাঁপছে, দুঃখে অভিমানে! কিংবা দুর্ভাবনায়!

বললে, ফিরে গিয়ে আপনাকে নিশ্চয় খুব কথা শুনতে হবে!

—জানি না। নন্দিতা চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আমি আর ভাবতে পারছি না। আমি কিছু লুকোব না, সব বলবো। আমি তো কিছু অন্যায় করিনি, যে যা ভাবুক, আমি তো জানি আমি কোনো অন্যায় করিনি।

সোমনাথ চমকে চোখ তুলে তাকালো নন্দিতার দিকে। ওর ভীষণ ভাল লাগলো নন্দিতাকে। নন্দিতার কথা। লাল পাড় কোড়া শাড়িতে ওকে একটা বিশুদ্ধ আগুনের শিখার মত মনে হলো। মনে হলো সেই আগুনের শিখায় ও কেবলি নিজেকে বিশুদ্ধ করছে।

সোমনাথ ধীরে ধীরে বললে, লুকোবার মত কোনো অন্যায় আমরা কেউই করিনি।

—টেলিফোন নম্বরটা মুছে ফেলেছি বলে আপনি দুঃখ পাচ্ছিলেন! অনেকক্ষণ পরে নন্দিতা বললো।

সোমনাথ বললে, এখন আর পাচ্ছি না। জানি, আপনার যদি সত্যি সত্যি কোনোদিন ইচ্ছে হয়, আপনি আর দীপকদের কাছেও লুকোতে চাইবেন না।

—আপনার দেওয়া এই লাল টগর আমি লুকোইনি। বলে নন্দিতা হাসলো। চুল থেকে টগরটা খুলে দেখালো।

সোমনাথ হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিজের হাতে নিল। নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো, গালে কপালে ছোঁয়ালো। দেখলো, ফুলটা তখনো দিব্যি তাজা, শুকিয়ে যায়নি।

নন্দিতা হাত বাড়িয়ে বললো, কই দিন, ফেরত দিন।

সোমনাথ দিল না। নিজের পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দিল। বললে, এখন তো আমার আর কিছুই নেই।

নন্দিতা মৃদু হেসে বললে, তখনো কিছুই ছিল না, তবু তো দিয়েছিলেন।

—তখন ভবিষ্যৎ ছিল। সোমনাথ হাসলো। বললে, এখন অতীতটুকুই আছে। আমি এটা যত্ন করে রেখে দেব আমার ডায়েরীর পাতার ফাঁকে। এর শুকনো

পাপড়িগুলো মাঝে মাঝে দেখবো। গন্ধ শুঁকবো।

নন্দিতা বললে, আমরা বোধহয় শুধুই একটা ডায়েরীর পাতা।

সোমনাথ হাসলো।—আপনারও নিশ্চয় একটা ডায়েরী আছে, না-লেখা ডায়েরী। তার সব পাতাগুলোই তো আপনি।

নন্দিতা হাসলো।—ঠিক বলেছেন। কিন্তু যে-পাতা যাকে নিয়ে লিখে থাকি না কেন, সে-পাতা শুধু আমিই। একা আমি।

সোমনাথ চুপ করে রইলো। ওর মনে হলো ওরা হাসতে হাসতে যেন খুব গভীর কোনো কথা বলে ফেলেছে। ওর মনে হলো, খুব সত্যি কোনো কথা বলে ফেলেছে।

সোমনাথ হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের মত করে বললে, আমরা সব-সময়েই একা। পিকনিকে আসার সময় মনে হয়েছিল, আমরা সব এক হয়ে গেছি। অথচ দেখুন, শুধু একটা গাড়ি স্টার্ট নিলো না, এখন আমরা প্রত্যেকে একা।

নন্দিতা বললে, ফুলটা আমাকে ফেরত দিন।

—কেন? ফেরত নিতে চাইছেন কেন?

ও গাঢ় গলায় বললে, এখন তো স্মৃতিই আমার একমাত্র সঙ্গী।

গাড়িটার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল দীপকের। একটা ছোট্ট সুখ ওর জীবনটাকে সর্বদিক থেকে তেতো করে দিতে পারে ও জানতো না। মাঝে মাঝে ওটাকে নিয়ে ও ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। টুকটাক এটা-ওটা গোলমাল হলেই ও বিরক্ত হয়ে উঠতো। কখনো কখনো ভেবেছে, ওটাকে বেচে দিয়ে স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠবে। তখন আর অতীশ বলবে না, 'অত রাখী রাখী করিস না, সব জানা আছে, ও তোর গাড়ির প্রেমে পড়েছে।' দীপকের নিজেরও এক-একবার সন্দেহ হয়েছে। অতীশ একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আলাপ হওয়া। আমার সঙ্গে আগে আলাপ হলে আমারই প্রেমে পড়তো।' দীপকের কখনো কখনো তেমন সন্দেহও হয়েছে। তাই রাখীর জন্যে ওর যতখানি গর্ব ততখানি ভয়। রাখীর খামখেয়ালীপনার জন্যে দীপক তো ভিতরে ভিতরে অনেক সময় বিরক্তই হয়। অথচ রাখীর মতই গাড়িটার জন্যেও ওর গর্ব। কিন্তু সেটা শেষ অবধি এমন অবিশ্বাসী হয়ে উঠবে, ও ভাবতেই পারেনি। এমন তো কোনোদিনই হয়নি। গাড়িটার ওপর দীপকের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল, অথচ গাড়িটা ওকে রহস্যের মত টানছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, আরেকবার গিয়ে দেখি, এই রাত্রেই। দিব্যি এখান অবধি পৌঁছে দিল, কোথাও কোনো ঝামেলা বাধালো না। অথচ ফেরার সময় কেন যে স্টার্ট নিতে চাইলো না দীপক বুঝতেই পারছে না। 'সব তোমার চক্রান্ত', ভাবলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়।

হাইওয়ে ধরে ইতুর পাশাপাশি হাঁটছিল ও। ফুটফুট করছে আলো, ব্রীজ থেকে নেমে চওড়া পীচের হাইওয়ে এখন আলোয় ধোয়া। নিশুতি রাত আলো মেখে কেমন একটা গা-ছমছম রহস্যের মত।

কোত্থেকে কি যে হয়ে গেল, দীপক এখন আর ভাবতেও পারছে না। কেন এমন হলো? রাখীকে ও তো এতদিন ভালবেসে এসেছে; রাখীও। ব্রীজের ছায়ায় বালির ওপর ওরা দু'জনে যখন বসেছিল, তখন রাখীর চোখে ও নিজের ছায়া দেখেছে। রাখী ওর কাছে ধরা দিতে চেয়েছিল, রাখীর দুটি চোখে কপালে ঠোঁটের ওপর স্পর্শে ও স্বীকৃতি অনুভব করেছিল। ঠিক সেই সময়েই ভিখিরি ছেলেটা এসে সব বিস্বাদ করে দিয়ে গেল। তবু দীপকের ভালবাসা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি। অথচ গাড়িটা যেই স্টার্ট নিলো না, অমনি দীপকের মনে হলো সব যেন মুহূর্তে বদলে গেল। দীপক নিজেও। রাখী আরো। দীপকের এখন মনে হচ্ছে রাখী ওর একেবারেই অচেনা। রাখীকে ও যেন একটুও চিনতো না। ইতু, ইতুও যেন হঠাৎ বদলে গেছে। ওকে কেমন রহস্য রহস্য মনে হতো, আজ এখন ইতুকে যেন অন্য আলোয় দেখছে ও। খুব আপন মনে হচ্ছে। এখন ও শুধুই রহস্য নয়।

—চারদিকে কি সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, এত আলোর রাত আমি কখনো দেখিনি। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ইতু বললো।

দীপক হঠাৎ ভাবলো, এমনি আলোই ছিল তখন। কিন্তু মিস্ত্রীটা যখন ব্যাটারীতে তার লাগিয়ে বাল্‌ব জ্বাললো, সব উল্টে গেল। শুধু ঐ বাল্‌বের আলোকেই মনে হলো একমাত্র আলো, চারদিকের ফুটফুটে জ্যোৎস্নাকে মনে হচ্ছিল গাঢ় অন্ধকার। গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে এখন সবই যেন তেমনি পাল্টে গেছে।

ইতুর সুন্দর শরীরটার দিকে একবার স্থির হয়ে তাকালো দীপক। 'আমরা তো সব এক প্যাকেট তাসের মত।' দীপক নিজেকে প্রশ্ন করলো, সত্যি বোধহয়

আমাদের নিজেদের কোনো পরিচয় নেই, কোনো চরিত্র নেই। একবার শাফ্‌ল করলেই আমরা এক একজনের পাশে এসে দাঁড়াই। তখন আমাদের সব কিছু বদলে যায়। ইতু এখন আর একটাও স্মার্ট কথা বলছে না। ও এখন যেন গভীরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

—রাখী কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসে। ইতু হঠাৎ বললে। যদিও দীপকের সঙ্গে এই নির্জতার মধ্যে হাঁটতে ওর ভাল লাগছিল। সেজন্যেই সার্কিট হাউসের সামনের ঝোপের নীচে শান বাঁধানো ঘাটে দুটি ছায়ার শরীর দেখেও দীপককে কিছু বলেনি। ভেবেছিল, তা হ'লেই এই ভাল-লাগাটুকু দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

কিন্তু রাখীর কথা দীপকের একটুও ভাল লাগলো না। চক্রান্ত! যেন সত্যিই শুধু একটা শরীরের লোভে দীপক এমন একটা চক্রান্ত করতে পারে।

ও চাপা গলায় বললে, ঐ গাড়িটার কাছে একবার যাব। গাড়িটা আমাকে টানছে।

ইতু হাসলো।—গাড়িটার মধ্যে আপনি বাঁধা পড়ে গেছেন।

দীপকের মন বললো, প্রেমের মধ্যে। রাখীকে ভালবেসে ওর সব কল্পনা হারিয়ে গিয়েছিল। দীপকের এক একসময় মনে হতো ও ভালবাসার খাঁচায় আটকে পড়েছে। বন্দী হয়ে গেছে। ইতুর সুন্দর শরীর, ওর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়া পুরুষ্টু বেণী, ওর চলার ছন্দ, হাসি, এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী দীপকের মন আলো করে দিয়েছে। অথচ এখনও ভেঙে যাওয়া একটা তিক্ত প্রেম ওকে বেঁধে রেখেছে। ঐ তিক্ততাকে বয়ে নিয়ে বেড়ালেই দীপক ভালো, ভীষণ ভালো।

ইতু, ইতু, আমার বুকের মধ্যে একটা অশান্তি জ্বলছে। ইতু, ইতু, আমার ইচ্ছে করছে তোমার কানের পাশে একটা তীব্র সত্য উচ্চারণ করতে। এখন আমরা সকলেই একা। আমরা প্রত্যেকে। আমরা একাই ছিলাম, একাই থাকবো। তবু রাখী আমাকে বন্দী করে রেখেছে, আমার সব সাহস কেড়ে নিয়েছে। আমি সেই সত্যি কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছি।

—তোমাকে আজ একটা সুন্দর রহস্যের মত লাগছে ইতু। অথচ খুব চেনা, খুব আপন মনে হচ্ছে। হাইওয়ে থেকে নেমে যাওয়া সরু ঢালু রাস্তাটার বাঁক ঘুরতে ঘুরতে দীপক বললে।

ইতু কোনো কথা বললো না। দীপকের কথাগুলো ওকে অবাক করলো, ওর খুব ভাল লাগলো। তবু একটা দ্বিধা এসে ওর পথ আগলে দাঁড়ালো।

ইতু বললে, আপনি রাখীর কথা একটুও ভাবছেন না।

রাখীর কথা সত্যিই মনে পড়ছিল দীপকের। মনে পড়ছিল বলেই ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল।—এই, কলেজের বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়! রাখী বলেছিল।

দীপকের একটুও ইচ্ছে ছিল না, তবু ও রাজী হয়েছিল।

একটা অল্প খরচের রেস্টোরেন্টে ওরা এসে বসেছিল।

নিরঞ্জন, অরূপ আর সুধাকান্ত। সুধাকান্তকে ওরা সবাই ডাকনামে 'গোরা' বলে ডাকছিল।

পরিচয় হ'তেই অরূপ বললে, গোকুলে বাড়ছিলেন, আমরা খবরই রাখিনি। আমরা জানতাম রাখী আমাদেরই।

রাখী হেসে উঠলো, সকলেই। দীপক হাসবার চেষ্টা করেছিল। আর রাখী বলেছিল, গোরা, তোর কোনো চান্স ছিল না।

সুধাকান্ত হেসেছিল।—থাকলেও এগোতাম না। নিরঞ্জন আমাকে নক-আউট করে দিতো।

নিরঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দীপকের চোখ এড়ায়নি। নিরঞ্জন বলেছিল, আমি তো ভাবতাম অরূপই...

রাখী হেসে উঠেছিল।—সেই একদিন, অরূপ, তুই তো আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলি।

অরূপ হেসে বলেছিল, বাঃ, একদিন তো ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলি আমার সঙ্গে। আমি ইচ্ছে করলে তোকে হাত করতে পারতাম।

রাখী হেসে উঠেছিল, চেষ্টা তো করেছিলি। কেবল, জানিস গোরা, ফাঁকার দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল। কথার মধ্যে হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল রাখী। —একদিন ট্যাক্সিতে কাঁধে হাত রাখতে চেয়েছিল।

অরূপও হাসলো।—নিরঞ্জনের সঙ্গে একদিন সিনেমা গিয়েছিলি শুনেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ওদের সমস্ত কথা ভঙ্গি ব্যবহার অসহ্য লাগছিল দীপকের। একটা বিশুদ্ধ প্রতিমাকে কল্পনা দিয়ে গড়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল দীপক। আর ঐ ছেলেগুলো সেই প্রতিমার গায়ে যেন নোংরা জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। দীপকের সবচেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল রাখীর ওপর। ওর মনে হচ্ছিল রাখী শুধু নিজের সম্মান নয়, দীপকের সম্মানও মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে।

আজ আবার রাখীকে ঠিক তেমনি মনে হলো। আজ আবার ও দীপকের সম্মানকেও মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সেদিনের কথা মনে পড়তেই দীপকের সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে গেল। ওর মনে পড়লো সেদিন ওরা সকলেই হেসেছিল, রাখী আরো বেশী। শুধু দীপক নিজেই হাসতে পারছিল না। রাখী আর অরূপের মধ্যে একবার যেন চোখের ইশারা দেখেছিল ও। কিংবা মনের ভুল। তবু একটা সন্দেহের কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে গিয়েছিল।

ইতুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অকারণেই সেদিনের কথা মনে পড়লো দীপকের।

ইতু হঠাৎ একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, আমাকে দেখে আজ কি মনে হচ্ছে আপনার?

ইতু বোধহয় কিছু শুনতে চাইছিল। কিন্তু দীপক ওর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললে, দেখে মনে হচ্ছে, এ কুইন অফ মিস্ট্রি!

সশব্দে হো হো করে হেসে উঠলো ইতু। বললে, আপনার আপাতত একজন মিস্ত্রীর দরকার। কাল সকালেই পাবেন।

দীপক বললে, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ ইতু।

ইতু কোনো কথা বললো না, শুধু কব্জির ঘড়িটা দেখলো। কিন্তু ক'টা বাজছে বুঝতে পারলো না।

ততক্ষণে ওরা গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেছে। চাঁদ ঢলে পড়েছে এক কোণে, তখন আর গাড়িটা ফুটফুট করছে না, গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে।

চাবি লাগিয়ে গাড়ির দরজা খুললো দীপক, উঠে বসলো, ওদিকের দরজার লক্ খুলে দিয়ে ইতুকে বললে, উঠে এসো, তোমাকে আজ আমার অনেক কথা বলার আছে।

—প্রেম আছে, আপনি এইমাত্র আবিষ্কার করেছেন, শুধু এই তো? ইতু হেসে সমস্ত গভীরতাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই পরিবেশের মধ্যে কি যেন ছিল, ওর মনে হলো ও একেবারেই বদলে গেছে। ঠিক অতীশকে ও

সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা। বার বার হর্ন দিলো দীপক। ইতুকে বললে, শীগগির, শীগগির।

ইতু নেমে পড়েই ওদের ডেকে আনার জন্যে ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই হর্নের শব্দ শুনে সোমনাথ আর নন্দিতা বেরিয়ে এসেছে।

নন্দিতা বিস্ময়ে আনন্দে প্রশ্ন করলো, সে কি, ঠিক হয়ে গেছে?

ইতু চিৎকার করে ডাকলো, রাখী, রাখী!

আড়াল থেকে নদীর ঘাটের মেটে রাস্তা দিয়ে রাখী আর অতীশকে আসতে দেখা গেল। ইতু অতীশের চোখের দিকে তাকালো, অতীশ চোখ নামিয়ে নিলো। দীপক রাখীর দিকে তাকাতে পারলো না, রাখী চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো।

—ওঠ রাখী, ওঠ। নন্দিতা, উঠে পড়। ইতু বললে।

দীপক অতীশের দিকে তাকাতে পারলো না। শুধু বললে, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

ওরা ছুটে গেল ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে আসতে।

তাড়াহুড়ো করে ওরা সকলেই উঠে পড়লো। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে আবার ব্রীজের দিকে, হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চললো।

আর সোমনাথ হঠাৎ একসময় বলে উঠলো, এত তাড়াহুড়ো করার কোনো মানে হয় না।

সকলেরই সেই কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরলো। এত তাড়াহুড়ো করার কোনো মানে হয় না। সোমনাথের কথাটা নন্দিতার ভীষণ ভাল লাগলো। ও সোমনাথের মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো।

তখন কেউ আর কোনো কথা বলছে না। সকলেই চুপচাপ। সত্যি, এত তাড়াহুড়ো করার কীই-বা অর্থ হয়।

ব্রীজের ওপর থেকে ওরা দেখতে পেল জ্যোৎস্নাহীন অন্ধকারেই নদীর বুকে জেলেদের নৌকো নামছে। চারদিক নিঃশব্দ। ওরাও সকলেই চুপ করে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। হয়তো ভয়ংকর কোনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে ওরা মনে মনে মিথ্যের জাল বুনছে।

হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে। আলোমাখা অন্ধকারের বুক চিরে হেডলাইটের তীব্র আলো ছুটে চলেছে আরো আগে আগে।

অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে এসে ইতু হঠাৎ বলে উঠলো, আরে, কি আশ্চর্য, আমরা সব আলাদা হয়ে গেছি!

ওরা সকলেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে দেখলো। সত্যিই, ওরা সব আলাদা হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োয় কখন অতীশ আর সোমনাথ দীপকের পাশে গিয়ে বসেছে—সামনের সীটে। পিছনে ইতু, রাখী, নন্দিতা। আলাদা হয়ে গেছি! আলাদা হয়ে গেছি মানে আমরা সবাই এখন একা।

কেউ কোনো কথা বললো না। শুধু নন্দিতা হঠাৎ বললে, এত জোরে চালাচ্ছেন কেন দীপকদা? আমাদের তো এখন আর তাড়াতাড়ি কোথাও যাওয়ার নেই, তাড়াতাড়ি কোথাও পৌঁছতে হবে না।

আমাদের কোথাও যাওয়ার নেই, মনে মনে ভাবলো ওরা, আমাদের কোথাও পৌঁছতে হবে না। না, প্রেমও না। আমাদের শেষ অবধি সেই ফিরে যেতে হয়—স্মৃতির মধ্যে—ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি স্মৃতির মধ্যে। আমাদের কোথাও যাওয়া হয় না—ইতু রাখী নন্দিতা তিনজনই ভাবলো, হয়তো বা দীপক অতীশ সোমনাথও।

তাই □ মারি রাজাগ' তামা আচুগনাই সায়দি ঃ

৫ = ৫৫	৬ দশ + □ = ৬১
□ = ৫৬	৬ □ + ২ = ৬২
= □	□ দশ + ৪ = ৬৪
= ৫৮	৬ দশ + □ = ৬৬
৯ = ৫৯	৬ দশ + ৮ = □
□ = ৭৫	৮ দশ + □ = ৮৭
= □	৮ দশ + ৮ = □

চিকাইচার (চারচি)

৮১ চি কাইচার তেই সা, চ
৮২ চি কাইচার তেই নায়, চ
৮৩ চি কাইচার তেই থাম,
৮৪ চি কাইচার তেই বারীয়
৮৫ চি কাইচার তেই বা, চ
৮৬ চি কাইচার তেইদক. চ